আর্য্যাবর্ত্ত।

(জনৈক বঙ্গ মহিলার ভ্রমণ বৃত্তান্ত

প্রথম ভাগ।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"।

শ্রীমতী "বনলতা" ও "নীহারিকা"
রচয়িত্রী কর্ত্তৃক প্রণীত।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও
প্রকাশিত।

---

৫৫ নং অপার চিৎপুর রোড।

সন ১২৯৫ পৌষ।

উপহার।

প্রাণাধিকা—

কুমারী শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী

চিরায়ুষ্মতীষু—

মা-প্রিয়,

ভূত ভারতের গৌরব কাহিনী আর্য্যকীর্ত্তি অদ্য উপকথা নহে, বিন্ধ্য হইতে হিমগিরি যাহার অভ্রভেদী নিদর্শন, গঙ্গা যমুনা সরযু যাহা করুণ বিলাপে অবিরাম গাইতেছে, অযোধ্যা হস্তিনা এবং ইন্দ্রপ্রস্থে অতীতের আধভগ্ন স্মৃতিরূপে অদ্যাপি যাহা বিদ্যমান দেখিলাম, সেই পুণ্যভূমির সে পবিত্র গৌরব আজি নাই বলিয়া আমরা কাঁদিতে পারি কিন্তু তাহা কাল্পনিক স্বপ্নময় উপন্যাস মনে করিতে পারি না। ভীমার্জ্জুন যুধিষ্ঠির, কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন, প্রতাপ সিংহ এবং পৃথুরায় যে দেশ ধন্য করিয়াছিলেন সেই বীর-মাতা ভারতের কেন এমন অধঃপতন হইল ও কেনই বা

আজ ভারত জননী মুষ্টিমেয় বিদেশী করে এবং "অপুত্রিকা শত পুত্র বিদ্যমানে" হইলেন তাহা তুমি বলিকাবস্থায়ই কতক অবগত হইয়াছ কি? তবে অন্য কথা শুন, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, দ্রৌপদী ও লক্ষ্মীরাণী প্রভৃতি পুণ্যবতী প্রাতঃস্মরণীয়া আৰ্য্যনারীগণ যে দেশের মুখোজ্বল করিয়াছিলেন সেই দেশে তুমিও জন্মিয়াছ এইটী সতত স্মরণ রাখিয়া তাঁহাদিগের উচ্চতম আদর্শে এবং তাঁহাদেরই পদানুসরণে অদ্যকার বিজাতিসভ্যতাবিড়ম্বিত না হইয়া যথার্থ হিন্দু মহিলার উপকরণে নিজের সুকুমার হৃদয় ও কিশোর চরিত্র সুগঠিত কর। তাহা হইলেই তোমার জননীর অবিরামবাহী নীরব স্নেহের কতক প্রতিদান হয়। সংসারের বাহ্য প্রকাশিত অন্তঃসার শূন্য স্নেহানুভবে অসমর্থ ও জর্জ্জরিত এ হৃদয়—যে স্নেহ বাক্যহীন কার্য্যে তোমার মঙ্গল কামনায় অনিবার ঢালিয়া দিতেছে—ভাষায় তাহা কখনও প্রতিফলিত হউক, আর নাই হউক, সেই নিস্তব্ধ গভীর স্নেহের ক্ষুদ্র আশীর্ব্বাদ স্বরূপ এই

"আর্য্যাবর্ত্ত" (ভ্রমণ) যুগান্তের ঐতিহাসিক মহিমা-গাথা স্বদেশ প্রেমের চিহ্নরূপে তোমাকেই স্নেহোপহার দিলাম।

কৃষ্ণনগর
অগ্রহায়ণ,
১২৯৫ সাল

বিজ্ঞাপন।

বঙ্গমহিলার ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠকের কেমন লাগিবে তাহা জানি না। আমি যাহা দেখিয়াছি, দেখিয়া যাহা ভাবিয়াছি তাহা লিখিলাম। অন্তঃপুর রুদ্ধা বঙ্গ নারী তীর্থ যাত্রা উপলক্ষে কখন কখন দেশ ভ্রমণ করিয়া থাকেন। কিন্তু দেশ ভ্রমণকালে যে সকল দৃশ্য তাঁহাদের নয়ন গোচর হয়, প্রকৃতির বৈচিত্র্যময় সৌন্দর্য্য লীলাতে নারীর কোমল হৃদয়ে যে সকল ভাব উদিত হয়, মনুষ্যের ক্ষমতার পরিচায়ক নানাবিধ কীর্ত্তি দেখিয়া মনে যে চিন্তা প্রবাহ বহিতে থাকে, পথি মধ্যে নারীকে যে সকল অপ্রত্যাশিত ঘটনার হস্তে কখন কখন নিক্ষিপ্ত হইতে হয় তাহার বর্ণনা প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। সেই জন্য হয়ত আমার সামান্য ক্ষমতায় ও আমি যাহা কিছু লিখিতে পারিয়াছি তাহা কাহার কাহারও পাঠ করিবার ঔৎসুক্য হইতে পারে। সংসারে যেমন বর্ণনা করিবার শক্তি সকলের সমান নহে, তেমনি দেখিবার শক্তিও সক-

লের সমান নহে। একজন সমুদায় পৃথিবী ঘুরিয়াও কেবল মৃত্তিকা এবং ইষ্টক ভিন্ন আর কিছু দেখিতে পাইল না, আর একজন একটী মাত্র দেশে বা নগরে বা গ্রামে, মানব জাতির আচার ব্যবহার, সমাজের গূঢ় তত্ত্ব, রোগের উৎপত্তি, সভ্যতার বিকাশ, বিজ্ঞানের উন্নতি সম্বন্ধে কত কি দেখিতে পাইলেন। যাহার সে পরিমাণে জ্ঞান আছে তাহার সেই পরিমাণে দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। সুতরাং আমি অধিক দেখিতে পাইয়াছি বা যাহা দেখিয়াছি তাহা ইচ্ছনীয়ভাবে বর্ণনা করিতে পারিয়াছি তাহা অবশ্য মনে করি না। কিন্তু পুরুষের চক্ষে যাহা যেরূপ দেখায় নারীর নেত্রে তাহা ঠিক সেইরূপ না দেখিতে পারে। সেই জন্য বঙ্গ নারীর চক্ষে ও হৃদয়ে এই ইতিহাসময় আর্য্যাবর্ত্তে ভিন্ন ভিন্ন স্থান কি রূপে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল তাহা কেহ কেহ জানিতে ইচ্ছা করিতে পারেন এবং তাই আমার ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে আমি যাহা দেখিয়াছি তাহা বর্ণনা ও প্রকাশ করিতে সাহসী হইলাম।

আর এক কথা আমার নির্জ্জন জীবন শুভ কার্য্য-ময়তায় প্রফুল্ল করিতে যে মঙ্গল ইচ্ছার উৎসাহজনক সাহায্যে এই ভ্রমণ অদ্য পুস্তকাকারে পরিণত হইল, কিন্তু অবস্থানুসারে সে বিষয় একটী মাত্র কথাও বলা হইল না—বাক্যে তাহা কখন পরিস্ফুট হউক আর নাই হউক, হৃদয় তাহাতে আমরণ এমনি নীরব ঘণীভূত কৃতজ্ঞতায় পরিপ্লুত রহিবে।

সূচী পত্র।

বিষয়			পৃষ্ঠা।
অবতরণিকা	...	...	১
এটোয়া	...	...	৭
এটোয়া পরিত্যাগ	...	...	২৬
অগ্রবন	...	...	৩১
তাজ	...	...	৩৩
দুর্গ	...	...	৪১
মথুরা	...	...	৫৭
বৃন্দাবন-পথে	...	...	৭৭
বৃন্দাবন	...	...	৮০
বিদায়	...	...	৯৯
ইন্দ্রপ্রস্থ ও দিল্লী	...	...	১০৬
লৌহদ্বার	...	...	১১৩
কেল্লা	...	...	১১৫
হামম	...	...	১১৬
ময়ূর সিংহাসন	...	...	১১৭
জুম্মা মসজিদ্	...	...	১১৯
হুমায়ূ মাকবারা	...	...	১২৫
শ্মশান	...	...	১২৯
বাউলি	...	...	১৩৩
আজবঘর	...	...	১৩৫
কুতবমিনার	...	...	১৩৬
স্বদেশাভিমুখে	...	...	১৪১

অবতরণিকা।

শারীরিক অসুস্থতা কোন অবস্থাতেই কাহারও নিকট সুখকর কিংবা প্রীতিপ্রদ নহে। ইহার যন্ত্রণায় এই সৌন্দর্য্যময় বিশ্বজগৎ শোভা-শূন্য বোধ হয়, মানসিক তেজ ও চিন্তা-শক্তি ক্রমে শিথিল হইয়া যায়, কঠিন পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা লোপ পায়; কেহই ইচ্ছা করিয়া তাহা চাহে না। কিন্তু এই অসুখকর অসুস্থতায় আমার কিছু জ্ঞান লাভ হইয়াছে। এই অসুখে যে শিক্ষা ও আনন্দ পাইয়াছি, তাহার স্মৃতি আমার নির্জ্জন-প্রিয় জীবনের একটী পবিত্র সুখ। মাতৃভূমির ঘটনা-পূর্ণ প্রধান প্রধান স্থান গুলি দেখিবার প্রবল ইচ্ছা হৃদয়ে যত্নের সহিত আশৈশব পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম; কখন যে সে অভিলাষ পূর্ণ হইবে আমার কিন্তু এমন বিশ্বাস ছিল না। অবরোধবাসিনী হিন্দুমহিলাদিগের পক্ষে দেশ ভ্রমণ কত যে অসম্ভব, তাহা সহজেই অনুমেয়। হিন্দু-ধর্ম্মে অচল

বিশ্বাসে, পূর্ব্বেও শত শত মহিলা তীর্থ দর্শনে যাইতেন এবং এখনও গিয়া থাকেন; তথাপি ইহা হিন্দু রমণীর পক্ষে যে তত সহজ সাধ্য নহে, ইহা কে না স্বীকার করিবে? দেশ ভ্রমণের কল্পনা অথবা স্বপ্ন আমার কখনই সফল হইত কিনা, তাহা আমি জানি না; কিন্তু শঙ্কটাপন্ন শারীরিক অসুস্থতা ও আত্মীয় স্বজনের উদ্বিগ্ন স্নেহে আমার এই অভিলাষ পরিপূর্ণ হইয়াছে।

দুর্ভাগ্যবশতঃ বাঙ্গালার জলবায়ু আমার অসুস্থ শরীরের পক্ষে অনুকূল নহে। কিন্তু স্নেহময় প্রিয়জন ছাড়িয়া দীর্ঘকাল দূরদেশে থাকা নিতান্ত কষ্টকর। আবার অন্যদিকে জীবন রক্ষা করিতে হইলে তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া মধ্যে মধ্যে বিদেশে যাইতে হয়। অসুস্থতাই আমার ভ্রমণের মুখ্য কারণ।

১৮,—সালে বর্ষার প্রারম্ভে আমার শরীর আবার দিন দিন অধিকতর অসুস্থ হইতে লাগিল। এবং চিকিৎসকের ব্যবস্থানুসারে ১৮—সালের ৩রা নবেম্বর তারিখে রাত্রি ৯টার সময় আমি জলবায়ু পরিবর্ত্তনের

জন্য কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিম যাত্রা করিলাম। আমার তখনকার শারীরিক অবস্থা এত শোচনীয় ছিল যে, আমি আরোগ্য হইয়া আবার দেশে ফিরিয়া আসিব কি না, সে-বিষয় আমার বন্ধু বান্ধবদের অনেকেরই সন্দেহ জন্মিয়াছিল।

আমার নিজের মনে তখন যে বিশেষ কোন নূতন আশঙ্কা হইয়াছিল তাহা এখন তত স্মরণ নাই, তবে মৃতপ্রায় অবস্থায় ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে গিয়া স্বাস্থ্য পুনর্লাভ করিবার জন্য বিষণ্নমনে আত্মীয় স্বজনের নিকট বিদায় মনে করিলে স্মৃতি এখনও আমার হৃদয়ে বিষাদ ঢালিয়া দেয়। সে যা-হোক্, ট্রেন ছাড়িল; সঙ্গে দুই সহোদর থাকিলেন, আর সকলে বিদায় লইলেন। ক্ষণকাল পরেই কেবল শকটের ভীষণ ঘর্ঘর শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল।

অশান্তিময় রাত্রি নিদ্রা অনিদ্রায় কোন রূপে কাটিয়া গেল। প্রভাতে জাগিয়াই বুঝিলাম যে, আমরা অনেক দূরে আসিয়াছি। ভ্রাতার মুখে

শুনিলাম "নোয়াদি"। আমার পূর্ব্ব পরিচিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈল-রাজি পরিশোভিত "নোয়াদির" নাম শুনিয়া তাহার প্রাতঃ-সূর্য্য-রশ্মিময় শোভা দেখিবার ইচ্ছা হইল, কিন্তু গাত্রোত্থানে অসমর্থ, সে সাধ পূর্ণ হইল না।

অপরাহ্নে গাড়ী যখন মৃজাপুরের মধ্যে দিয়া যাইতে লাগিল, তখন বিন্ধ্যগিরির শিরে সূর্য্যের অস্তগামী অপূর্ব্ব শোভা নিরীক্ষণ করিয়া আমার সহোদরদ্বয় বিমুগ্ধ হইয়া আমাকেও তাহা একবার দেখাইবার নিমিত্ত মুহূর্ত্তের জন্য শয্যাতে উঠাইয়া বসাইলেন। আমি সেই অনির্ব্বচনীয় জীবন্ত সৌন্দর্য্য দেখিয়া এবং প্রদোষের স্বাস্থ্যকর নির্ম্মল বায়ু সেবন করিয়া একটু যেন জীবন পাইলাম ও সুস্থ হইলাম। আমার সৌন্দর্য্য-প্রিয় কবি-প্রকৃতি বন্ধুগণের সহিত যে একত্র হইয়া সেই স্বর্গীয় শোভা দেখিতে পাইলাম না, তখন তাহাই কেবল মনে হইতে লাগিল। কেমন শূন্যমনে উদাস-প্রাণে সেই কনক-কিরণের সৌন্দর্য্য সাগরে ভাসিয়া গেলাম। বঙ্কিমবাবুর "সাধের তরণী, আমার"

মনে আসিয়াছিল কিনা বলিতে পারি না, তবে এই সংসারে এই অনন্ত বিশ্বে অমিশ্রিত সুখভোগ হত-ভাগ্য মানবের ভাগ্যে কখনই প্রায় ঘটে না, নতুবা সেই নিরূপম মাধুরী হেরিয়া আমার চক্ষে জল আসিল ও হৃদয় অশ্রুসিক্ত হইল কেন? একের সুখ, দুঃখ, আশা, নৈরাশ্য অপরে সহজে অনুভব করিতে পারেন না, তাই আমার সেই-সায়াহ্ন হর্ষ-বিষাদ-কাহিনীও বলিতে ইচ্ছা নাই।

রাত্রি প্রায় ৮টার সময় গাড়ী কিছু বেশীক্ষণের জন্য থামিলে প্লাটফরমে হৈ, রৈ, কলরব, ডাক হাঁক শুনিয়া বুঝিলাম যে কোন একটী বড় ষ্টেসনে পোঁছিয়াছি। ইহা গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম স্থান সেই প্রয়াগ তীর্থ।

গাড়ী পুনর্ব্বার উদাসীন ভাবে চলিতে লাগিল। দ্বিতীয় প্রহর রজনীতে হঠাৎ অস্থিভেদী শীতে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, তখন আবার হৈ চৈ কলরব—বুঝিলাম গাড়ী কানপুরে আসিয়াছে। তাকাইয়া দেখিলাম একটী শ্বেত পুরুষ ও তাঁহার শ্বেতাঙ্গিনী পত্নী আমা-

দিগের গাড়ী মধ্যে বিরাজমান,—সৌভাগ্যক্রমে ব্রিটীশ সিংহ আমাদিগকে উদ্বেজিত না করিয়া ক্ষণকাল পরে মস্তকোপরি 'হ্যামকে' দোদুল্যমান হইলেন। তিনি উচ্চৈঃস্বরে শিষ্টাচারের সহিত আপনা হইতেই আমার সহোদরের সঙ্গে গল্প আরম্ভ করিয়া দিলেন। তাঁহার পত্নী আমাকে পীড়িত লক্ষ্য করিয়া স্বামীকে নীরব হইতে কহিলেন। যদিও অধিক সময়ই "ব্রিটীশ সিংহের বিকট বদন" রেল গাড়ী ইত্যাদিতে 'নিগার' দর্শনে আরও বিকটতর হয় এবং তাহাতে নানা প্রকার অপ্রিয় ঘটনাও সততই ঘটিয়া থাকে, তথাপি ইহা-দিগের ভদ্রোচিত আচরণে আমাদিগের কিছুমাত্র কষ্ট কি অসুবিধা হয় নাই। কর্ত্তব্যের অনুরোধে এই সামান্য ঘটনার উল্লেখ করা আবশ্যক বোধ হইল। অবশেষে অতি প্রত্যূষে গাড়ী এটোয়া থামিল, আমরা সেখানে নামিলাম ও আমাদিগের জন্য রক্ষিত যানে কোন এক আত্মীয় ব্যক্তির বাসায় গিয়া পৌঁছিলাম।

এটোয়া।

পশ্চিমের স্বাস্থ্যকর জল বায়ুর গুণে এবং যাঁহাদিগের বাসায় ছিলাম তাঁহাদের অক্লান্ত শুশ্রূষা ও যত্নে আমার শরীর দিন দিন একটু একটু সুস্থ হইতে লাগিল। যখন সাহায্য ভিন্ন শয্যা পরিত্যাগের অবস্থা হইল, তখন প্রত্যহ নিয়মিত রূপে অপরাহ্নে বায়ু সেবনে যাইতাম এবং তাহাতেই আমার রোগের উপশম হইতে লাগিল। পশ্চিমে পরিবর্ত্তন করিতে যাইয়া কেবল মাত্র গৃহরুদ্ধ থাকিলে কোন স্থায়ী উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই, ইহা চিকিৎসকদিগেরও মত এবং আমার নিজের সম্বন্ধে তাহার বিশেষ প্রমাণও পাইয়াছি।

তিন চারি মাস এটোয়া অবস্থান করিয়া আমার শরীর যখন অপেক্ষাকৃত কতক সুস্থ হইল, তখন শৈশবের স্বপ্ন, হৃদয়ের প্রিয় আশা ক্রমেই জাগরুক হইতে লাগিল। তখন পূর্ব্ব পুরুষদিগের কীর্ত্তি কলাপ, ইতিহাসের লক্ষ্য ভূমি, ভারতের তীর্থস্থান নয়ন

গোচর করিয়া ভারতের ভূত গৌরব অনুভব করিবার নিমিত্ত লালসা হৃদয়ে দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; কিন্তু আমার দুর্ব্বল স্বাস্থ্যের জন্য সে দেশের অনিষ্ট-কর শীত ঋতুর অবসান কথঞ্চিৎ অধীরতার সহিত প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। যে এটোয়ার উপাদেয় স্বাস্থ্যকর জল বায়ুর প্রসাদে আমার জীবন আবার কতক পরিমাণে আশাময় হইয়াছিল, সেই এটোয়ার বিষয় কোন কথা না বলিলে বড়ই অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ হইবে। তাই তাহার সম্বন্ধে এবং সেখানে থাকিয়া পশ্চিমের অন্যান্য বিষয় যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহা লিখিতেছি।

এটোয়া একটী ক্ষুদ্র নগর। তাহার দৃশ্য বড় সুন্দর, তরঙ্গায়িত (Undulating) ভূমি দূর হইতে কেমন পর্ব্বতময় বোধ হয়; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহার দূর-বর্ত্তী কোন স্থানেও পাহাড় নাই। তবে বেশ উচ্চ স্থান তাহা বাহিরে গেলে অনুভব হয়। পুরাতন সহরের নিম্নভাগ দিয়া ক্ষীণ যমুনা প্রবাহিতা, তাহার সলিল-হীন শোভা নেত্র-সুখকর নহে। যমুনার ঘাট-

গুলি অতি পরিপাটী রূপে বাঁধান এবং তাহার উপরে শিব মন্দির বিরাজিত। যমুনা-তীরে অসংখ্য ময়ূর ময়ূরী অকুতোভয়ে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে, যেন মনুষ্যের সহিত বন্ধুতা সূত্রে তাহারা চিরদিন আবদ্ধ, কাহারো পদশব্দ শুনিলে কখন দূরে যায় না।

যমুনার সহিত আর্য্যজাতির বিগত কালের অনেক মহিমার স্মৃতি বিজড়িত আছে বলিয়াই হউক, কিম্বা তাহার প্রদোষের নির্জ্জনতার সহিত আমার জীবনের নীরব সহানুভূতি ছিল বলিয়াই হউক, আমি সায়াহ্নে তাহার নির্জ্জন তীরে বসিয়া চিন্তা করিতে বড় ভাল বাসিতাম। কেমন যে শান্তি হৃদয়ে মিশিয়া যাইত, তাহাতে প্রবাসের একক জীবনের অভাব, অতীতের নৈরাশ্য এবং ভবিষ্যতের অন্ধকার বিস্মৃত হইতাম।

যমুনা তীরের অনতিদূরে একটী ভগ্ন দুর্গ ও তাহার উচ্চতর ভূমির উপর একটী ক্ষুদ্র গৃহ আছে, সেই গৃহের নাম "বারদ্বারী।" আমি নিজে গণিয়া দশ দ্বার পাইয়াছি; তবে কেন যে তাহার নাম "বার-দ্বারী" বলিতে পারি না। বাদসাহাদিগের সময়ের

দুর্গ, কালের কুঠারাঘাতে ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, এখন সে সম্বন্ধে বলিবার বিশেষ কিছু নাই। "বারদ্বারী"তে উঠিয়া চারি দিক চাহিয়া দেখিলে উপর গগনের অসীমতা এবং নিম্ন ভাগের সবুজ বৃক্ষাবলী ও চারি-পার্শ্বের অট্টালিকার ধবল-বর্ণ চূড়া কেমন মনোহর দেখায় এবং হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে চিন্তার স্বপ্নময় স্মৃতিরেখা অঙ্কিত হইয়া থাকে।

এটোয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর জেলা (Second Class District)। জজ সাহেব তিন মাস পরে "মৈনপুরী" হইতে দায়রার বিচার করিতে আইসেন এবং মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি অন্যান্য কর্ম্মচারী যেরূপ অন্য সকল জেলাতে থাকে এখানেও সেইরূপ আছে। Canalএর প্রসাদে Engineer সাহেবদিগের এদিকে খুব প্রাধান্য আছে—শুনিয়াছি, অনেক ফিরিঙ্গীকুলতিলক সাহেব গণ (?) ইহাতে নাকি প্রতিপালিত হইয়া থাকে। তাহাদের আবার "কালাআদ্‌মীর" প্রতি ঘৃণা কিছু বেশী। বর্ণের উজ্জ্বলতা থাকিলেও নীচ শোণিতের অপ-বিত্রতা আছে; সুতরাং স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণের প্রতি

ভালবাসা ও সম্মান প্রদর্শন করা যে কর্ত্তব্য, তাহা কিরূপে বুঝিবে ?

এটোয়ার কেনাল দেখিতে তত সুন্দর নহে, তবে তাহার জল বড় স্বচ্ছ। পশ্চিমে ইন্দারার জল ভিন্ন আর কোন জল পান করিবার নিয়ম নাই। ইন্দারা গুলি যেমন গভীর, তাহার জল তেমনি স্বাস্থ্যকর পানীয়।

এই স্থানের রাজপথগুলি বড়ই পরিষ্কার ও জনতা-হীন। সহরের মধ্যে অনেক বড় বড় নির্জ্জন বাস-যোগ্য বাঙ্গলো আছে। তাহাতেই ইংরাজগণ বাস করেন। স্থানীয় অধিবাসীদের বাসগৃহ গুলি নিতান্ত ক্ষুদ্র এবং রৌদ্র বাতাস পরিবর্জ্জিত ও শোভাশূন্য। এটোয়া শীত গ্রাষ্ম উভয় প্রধান স্থান, কিন্তু যাহাতে শীতের হাত হইতে সম্যক্ রূপে রক্ষা পাওয়া যায় সেইরূপ প্রণালীতে তাহাদের গৃহাদি নির্ম্মিত। এ প্রদেশে শীতে লোকে গৃহমধ্যে এবং গ্রীষ্মকালে ছাদে বা প্রাঙ্গণে শয়ন করে। সেই জন্যই গৃহে বায়ু প্রবেশের পথ নাই। এটোয়ার স্কুল, "তহসিল"

গৃহ এবং চিকিৎসালয় ইত্যাদি যে কয়েকটী অট্টালিকা আছে, তাহাই দেখিবার যোগ্য।

এখানকার ইংরাজী বিদ্যালয় ও তাহার ছাত্রনিবাস প্রভৃতি যাহা কিছু আছে, সে সমুদায়ই সদাশয় হিউম (Hume) সাহেবের নিঃস্বার্থ যত্নের ফল। তজ্জন্য তাঁহার নাম এখানে সর্ব্বজন পরিচিত। একজন বিদেশীয় রাজপুরুষের এই কীর্ত্তি কলাপ অবশ্যই প্রশংসনীয়। এটোয়ার মিউনিসিপাল উদ্যানটী অতি রম্য, সেখানে প্রত্যহ সায়াহ্নে শ্বেত পুরুষ ও শ্বেতাঙ্গিনী মহিলাগণ ক্রীড়া করেন। বড় যত্নে রক্ষিত স্থান,—

"গড়ের সমীপে আনন্দ উদ্যান
যতনে রক্ষিত অতি রম্য স্থান,
প্রদোষে প্রত্যহ হয় বাদ্য গান
নয়ন মন তনু জুড়ায়।"

দেবতার প্রমোদ কাননে অবশ্যই মানবের প্রবেশাধিকার নাই। ভ্রম বশতঃ যিনি প্রবেশ করিবেন, তিনি যমদূত দ্বারবান-হস্তে নিশ্চয়ই সম্মানিত হইবেন।

এখানে হিন্দু কি মুসলমান জাতি অধিক তাহা আমি বিশেষরূপে অবগত নহি। তবে ভদ্র বাঙ্গালীর সংখ্যা অত্যন্ত অল্প ও রাজপথে কখনই প্রায় বাঙ্গালীর মুখ দেখিতে পাওয়া যায় না। এদেশের আচার ব্যবহার এবং পরিচ্ছদাদিও আমাদিগের মত নহে। হিন্দুস্থানী পুরুষগণ ধুতি কি পায়জামা, চাপকান ও টুপি পরে, স্ত্রীলোকেরা "ল্যাংঘা" (ঘাঘরা) আঙ্গরাখা ও চাদর ব্যবহার করে। মুসলমান ও ক্ষত্রিয় রমণীগণ জুতা ও খড়ম পরিয়া থাকে। সাধারণতঃ এদেশের লোক সুস্থ, সবল ও কতকটা ফরসা, কিন্তু মুখে প্রায়ই বুদ্ধির তত আভা নাই বলিয়া বোধ হয়। বুদ্ধির প্রতিভাহীন মুখ মণ্ডল নয়ন প্রীতিকর নহে, এবং স্মৃতিতে গভীর রেখা অঙ্কিত করে না। এই কারণেই হউক, কিম্বা কি জন্য ঠিক বলিতে পারি না, আমি এদেশের সুন্দর মুখও দীর্ঘকাল দেখিয়া স্মৃতিতে রাখিতে পারি নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুস্থকায় বালক বালিকার বুদ্ধিহীন মুখচ্ছবিতে কেমন সুখের সহিত বিষাদ হৃদয়ে ঢালিয়া দিত—তাহাতে

কত কি ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথা, অস্পষ্ট ভাব মনে আসিত।

পশ্চিম অঞ্চলে খাদ্য সামগ্রী অতি সুলভ। দুগ্ধ ও নবনীত অতি উপাদেয়। অন্যান্য দ্রব্যও বেশ পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের বাঙ্গালার ন্যায় সুস্বাদ, রসনা-মোহন মিষ্টান্ন দুর্ল্লভ; তাই বুঝি রসনা-দাস বাঙ্গালী আজীবন পশ্চিম-বাসে আপনাকে অধিকতর হতভাগ্য মনে করেন? হিন্দুস্থানীগণ "দাল রুটি" প্রিয়—তাহারা রসনা তৃপ্তি অপেক্ষা শরীর পুষ্টি বোধ হয় অধিক ইচ্ছনীয় বিবেচনা করে। আমি স্পার্টান-দিগের "কাল ঝোলের" (black broth) পক্ষপাতী নহি, তথাপি একথা স্বীকার করি, আমাদিগের বাবুগণের আহার প্রণালী একটু পরিবর্ত্তন করিলে ক্ষতি নাই। হিন্দুস্থানীরা দিনান্তে কোনদিন একবার অন্নাহার করে, কিন্তু রুটিই ইহাদিগের প্রধান আহার। এমন কি ভিখারীদিগকে ময়দা কিম্বা রুটি ভিক্ষা দিবার প্রথা এদিকে প্রচলিত আছে।

ইহারা আরাম কাহাকে বলে তাহা বড় বুঝে না,

বাহিরের আড়ম্বর অধিক ভালবাসে। স্ত্রীলোকদিগের বেশ ভূষার প্রতি বিলক্ষণ দৃষ্টি আছে, কিন্তু তাহা সুমার্জ্জিত নহে। বঙ্গীয়া ভগিনিগণ ইহাদিগের ন্যায় অলঙ্কার পরিতে আজিও শিখেন নাই। ইহারা এতই অলঙ্কার প্রিয় যে, তাহার অভাবে সর্ব্বাঙ্গ "উলকি" দ্বারা চিত্রিত করিয়া পরিতৃপ্ত হয়। আমি যদি চিত্র বিদ্যায় পারদর্শী হইতাম, তাহা হইলে হিন্দুস্থানী নারীগণের বহুবিধ অলঙ্কার (জোড়া কড়া) পরিশোভিত দেহচ্ছবি চিত্র করিয়া আনিতাম, ও দেশীয় ভগিনিগণ তাহা দেখিয়া আমোদিত হইতেন।

এদেশের অবরোধ প্রণালী আমাদিগের দেশের অপেক্ষাও কঠিনতর, (হয়ত অত্যাচারী মুসলমান বাদসাহদিগের নিকটে বাস বলিয়া পুরাকালে আত্মসম্মান রক্ষার্থে অন্তঃপুর প্রথা এত অধিক কঠিন করা হইয়া থাকিবে। তবে সময়ে ও অবস্থার পরিবর্ত্তনসহ তাহার কোন নূতন সংস্কার আর যে করা আবশ্যক, তাহা এখন মনে হয় না) কিন্তু ইহার মধ্যে একটু নূতনত্ব আছে, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়। বিবা-

হাদি কোন উৎসবে ভদ্র মহিলাগণ পর্য্যন্ত "মঝোলীতে" (এক প্রকার গরুর গাড়ী) চাপিয়া আবরণের মধ্য হইতে উচ্চৈঃস্বরে Shelleyর "Skylark" এর অথবা কবি হেম বাবুর "চাতক পক্ষীর" মত লুকাইত থাকিয়া,—(যদিও "সুদূর গগনে উঠি গায় সুখে ছুটি ছুটি" নহে) রাজ পথে গীত গাইতে গাইতে—সঙ্গীত চূর্ণ ছড়াইতে ছড়াইতে চলিয়া যায়। ঈদৃশ রাজপথে বামা-কণ্ঠ-ঝঙ্কারে কোন লজ্জার বিষয় নাই, কেন না, সেই "রমণী বদন, পুরুষ নয়ন, নাহি দেখিতে পায়"। ইতর লোকের স্ত্রীলোকদিগের বাহিরে যাওয়া কোন দেশেই দোষাবহ নহে, প্রয়োজনে; তবে এদিকে তাহাদিগের একটু বেশী স্বাধীনতা আছে। সামান্য লোকের স্ত্রী কন্যাগণ প্রকাশ্য ভাবে ঘোঁড়ায় চড়িয়া কুটুম্ববাড়ী যাতায়াত করে। ইংরাজ মহিলাদিগের সম্বন্ধে কবিবর বলিয়াছেন যে "ধায় অশ্বপৃষ্ঠে অশঙ্কিতচিতে, কানন কন্দর উন্নতি গিরিতে, অপ্সরা আকৃতি পুরুষ সেবিতা" ইত্যাদি, কিন্তু ইহাদিগের অশ্বারোহণ দেখিয়া কাহারও মনে এ কবিতা মধুরে

আবৃত্তি করিতে ইচ্ছা হয় না ; কেবল একটা "হাস্য-ভাজন" ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়। বধূ দিব্য সাঁজে আবৃত মুখে অশ্বারূঢ়া, অনুগত ভক্ত স্বামী গঙ্গারাম অশ্বরশ্মি সজোরে ধরিয়া চলিয়াছে এবং মৃদুস্বরে উভয়ে মধুরালাপ করিতেছে! এই দম্পতি-দৃশ্য, অবগুণ্ঠনবতী স্বাধীনতার এবং অশ্বরশ্মি সংলগ্ন প্রেমের মধুর সমাবেশ, ইহা ইউরোপের মধ্য যুগের শিভল্‌রি (chivalry) হিন্দুস্থানে বিকশিত, তবে কি জানি, দেখে আমার কেমন একটু হাঁসি পায়। চারু-হাসিনী ভগিনি পাঠিকে, সহিসরূপী পতি সঙ্গে এই-রূপে অশ্বপৃষ্ঠে রাজপথে বিচরণ করিতে সখ যায় কি?

স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা হিন্দুস্থানীরা এখনও যেন আদৌ বুঝিতে পারে না। কখন কোন হিন্দু-স্থানী বালিকাকে পাঠ করিতে আমি দেখি নাই কিম্বা শুনি নাই। আমি মহারাষ্ট্রীয়া পণ্ডিতা রমা-বাইএর দেশের কথা বলিতেছি না, স্মরণ রাখিবেন। গৃহেও তাহাদিগের রীতিমত লেখা পড়া শিক্ষা দেওয়া হয় না। আমাদিগের দেশে যদিও স্ত্রীশিক্ষা কেবল-

মাত্র অঙ্কুরিত হইয়াছে, আজও তাহার শুভফল চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হয় নাই; তথাপি ইহার প্রয়োজনীয়তা অনেকে প্রায় বুঝিতে পারিয়াছেন এবং যাহাতে ইহা বহুল পরিমাণে প্রচলিত হয়, তাহারও কতক চেষ্টা করা হইতেছে। কিন্তু হিন্দুস্থানীদিগের মধ্যে সে চেষ্টাও প্রায় কোন খানে দেখি নাই। তাহাদিগের অন্তঃপুরবাসিনীগণ অজ্ঞানে ঘোর তমসাচ্ছন্ন। কি এই দেশে, কি বাঙ্গালায় স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিশেষ উদ্যোগ ও চেষ্টা আবশ্যক। আমাদিগের দেশে রাজনৈতিক উন্নতির জন্য যে রূপ চেষ্টা হইতেছে, তাহার অপেক্ষা স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের অধিক চেষ্টা হওয়া আবশ্যক। আমাদিগের দেশের পুরুষগণ নিজের অন্তঃপুরের মূর্খতা, কুসংস্কার এবং অন্ধকার দূর করিবার কোন চেষ্টা না করিয়া বাহিরে "দেশীয় উন্নতি" "দেশীয় উন্নতি" বলিয়া যে চীৎকার করেন, তাহার জন্য অনেক সাহেব তাঁহাদিগকে ধিক্কার দেন, অনেক সময় দেশীয়গণকে এই ধিক্কারের উপযুক্ত পাত্র বলিয়া বোধ হয়।

হিন্দুস্থানীগণ অধিকাংশ পৌত্তলিক, কিন্তু আমাদিগের দেশের ন্যায় এদিকে প্রতিমা পূজা তত প্রচলিত নাই। মহাদেব কিম্বা অন্য কোন বিগ্রহ যাহা যেখানে আছে, তাহারই মধ্যে মধ্যে পূজা করিয়া থাকে। জৈন এবং বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিগণ মূর্ত্তিবিহীন মন্দিরে উপাসনা করে। অহিংসাই ইহাদের পরম ধর্ম্ম, সেই জন্য ইহারা সন্ধ্যাকালে গৃহে প্রদীপ জ্বালে না ও কীটানু সেই দীপে দগ্ধ হইবে আশঙ্কায় অন্ধকারেই আহারাদি করিয়া রাত্রি অতিবাহিত করে। দীন দরিদ্র অতিথিগণ শূন্য হস্তে কখনই ইহাদিগের দ্বার হইতে চলিয়া যায় না, নিজে উপবাস করিয়াও অতিথি সেবা করে। কর্কশ বাক্যে কখন কাহার মনে কষ্ট দেয় না। প্রাণী মাত্রের দুঃখ দূর এবং অহিংসাই যাহাদিগের পরম ধর্ম্ম, তাহারা অবশ্যই আমাদের পরম শ্রদ্ধার পাত্র।

আজি কালি আবার বাল্যবিবাহ অনেক ইংরাজিনবিশ পসন্দ করিতেছেন, কিন্তু আমি তাহার উপকারিতা এখনও বুঝিতে পারি নাই। আমার বোধ

হয় বঙ্গভূমির অধঃপতনের একটী প্রধান কারণ বাল্য-বিবাহ। সেই বাল্যবিবাহ-স্রোত এদিকে ভীষণ-বেগে প্রবাহিত দেখিয়া সুখী হইতে পারিলাম না। মাতৃগর্ভে সন্তান, পিতা মাতা প্রতিশ্রুত হইল; সুতরাং শিশুর জন্মের সহিত বিবাহ লিপি লিখিত হইয়া গেল এবং মাতৃগর্ভ-পরিত্যাগের পূর্ব্বেই পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইতে হইল। এই বিবাহ মনোহারিত্ব ও উপকারিতা আমার সহজ বুদ্ধিতে কখন অনুভব করিতে পারি না।

বিলাতী সভ্যতার সংস্পর্শে এখনও এদিকে অখাদ্য ভক্ষণাদি প্রচলিত হয় নাই। ধর্ম্ম এবং জাতি অদ্যাপি ইহাদিগের নিকট অতি যত্ন-রক্ষিত পবিত্র সামগ্রী। এমন কি, ইহারা বাঙ্গালীর স্পৃষ্ট কোন দ্রব্য ভক্ষণ করে না, বঙ্গীয় ব্রাহ্মণেরা জাতিচ্যুত এবং বাঙ্গালী মাত্রেই "খৃষ্টান" এই এদেশের লোকের দৃঢ় বিশ্বাস। লালা (কায়স্থ) ভিন্ন ব্রাহ্মণ কিম্বা ক্ষত্রিয় এদেশে কখন মদ্যপান করে না। একটী সুখের বিষয় যে, সুরাপায়ী ব্রাহ্মণ কি ক্ষত্রিয় সমাজের পরিত্যক্ত

সন্তান। কিন্তু নীচ জাতীয়দিগের মধ্যে “মৌয়া” (একরূপ মদ্য) অথবা “তাড়ি” পানের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব।

এদেশে জমিদার অর্থে ধনী ব্যক্তি নহে, যাহার কিছু জমি আছে সেই “জমিদার।” এক বিঘা কি ততোধিক জমি থাকিলেই জমিদার নামে অভিহিত হইতে পারা যায়। কিন্তু ক্ষেত্রে গিয়া দেখিবে যে, জমীদারগণ হলধর; নিজ হস্তে ভূমি কর্ষণ করিতেছে, তাহাতে বিন্দুমাত্র অপমানের বিষয় নাই। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি নিজে কৃষি কার্য্য করিয়া থাকে। দাসত্বের রাজ ভোগে পাদুকা লেহনে জীবন অতিবাহিত না করিয়া এরূপ স্বাধীনতায় কৃষিকার্য্য করার গৌরব, হতবীর্য্য বাঙ্গালী পুরুষগণ অনুভব করিতে পারিবেন না হয়ত। তাহাদিগের কৃষিকার্য্যে লোভনীয় হল লেখনী, এবং বিস্তৃত ক্ষেত্র শাদা কাগজ, এবং প্রতি বৎসরের প্রচুর ফসল অপমান। ভগিনী পাঠিকে, আমাদিগের স্বামী বা পিতা বা ভাই যখন চাকুরী (দাসত্ব) করিয়া টাকা আনিয়া দেন সে টাকা

দিয়া আমরা গহনা ও শাড়ী কিনি আমরা কি মনে করি তাহা কত অপমানের টাকা? কত অপমান খাইয়া শ্বেতাঙ্গের কত পদাঘাত নিত্য সহ্য করিয়া সেই টাকা আনিতে হইয়াছে? না, আমরা তা ভাবিব কেন, স্বামী বা পিতার আপমানে আমাদের কি?

সাহস, বীরত্ব এবং আত্ম রক্ষার গৌরবে যে ক্ষত্রিয় জাতি জগতের ইতিহাসে আদর্শ স্থানীয়, সেই বীর বংশে দ্বারবানের জন্ম। তাঁহাদের আজ এই দুর্গতি হেরিয়া অন্তরে বিষাদের সঞ্চার হয় সত্য, তথাপি ব্রাহ্মণ জাতির নীচতায় প্রাণে দারুণ আঘাত লাগে। আর এক কথা বলি, পশ্চিমের সামান্য অবস্থার ব্রাহ্মণ-গণ মোট বহে এবং গরুর গাড়ী চালাইয়া থাকে, তাহা দেখিয়া আমার হৃদয়ে কত আঘাত লাগিত। তারা বড় মূর্খ, যে ব্রাহ্মণ শব্দের সহিত পবিত্র মহত্ত্বের স্মৃতি মিশ্রিত আছে, যে বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া আপনাকে এখনও কথঞ্চিৎ সুখী মনে করি, যাহার গৌরবময় প্রতিভার আলোক অন্ধকারময় শ্মশান ভারতের চারিদিকে অদ্যাপি দেখিতে পাই

এবং যাঁহাদিগের বুদ্ধি বিদ্যার অবিনশ্বর অত্যাশ্চর্য্য কীর্ত্তি ভাবিতেই আহ্লাদে ও ভক্তিতে রোমাঞ্চ হই এখনও, সেই জাতির এই শোচনীয় পতন কিরূপে সহনীয় হইতে পারে ? ধন, মান, কিম্বা বংশমর্য্যাদায় মনুষ্যে মনুষ্যে দূরতা কখনই ইচ্ছনীয় নহে, এবং যত শীঘ্র এই জাতিগত বৈষম্য বিদূরিত হয়, ততই সমাজের মঙ্গল ; তবুও হৃদয়ের দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত ব্রাহ্মণত্বের মহিমা ভুলিতে পারি না। সুদূর সাগর পারে রহিয়াও বিদেশী পণ্ডিত-প্রবর মোক্ষ মূলার যে জাতির গৌরব গীত নিয়ত উচ্চকণ্ঠে গাইতেছেন, যিনি ব্রাহ্মণত্বের উচ্চতা কখন বিস্মৃত হন না, আজি হতভাগ্য হইয়াছি বলিয়া সেই জাতির মহিমাময় পবিত্রতা কি রূপে ভুলিতে পারি ?

প্রখর বুদ্ধিবলে বাঙ্গালী সর্ব্বত্র পূজিত। পশ্চিমে বাঙ্গালীদিগের অত্যন্ত সম্মান ও তাহারা নিরীহ হিন্দুস্থানীদিগকে একরূপ চালাইয়া থাকে বলিলেও হইতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ বাঙ্গালী এদিকে আসিয়া সমাজ ভয় যেন একেবারে বিস্মৃত হইয়া যায়, কুৎসিত

আমোদ প্রমোদ এবং অসার গল্পে জীবন অতিবাহিত করিয়া থাকে। সাধারণতঃ উৎসাহ নাই, কার্য্য কিম্বা চিন্তা নাই, কেবল আলস্যে ও তাস পাশায় মূল্যবান সময় ক্ষেপন করিয়া সুখী হয়। এই ঊনবিংশ শতাব্দীর দর্শন বিজ্ঞান সাহিত্য কি রাজনীতির অবস্থা কিরূপ তাহা তাহারা অবগত হইতে ইচ্ছা করে না। সংবাদপত্র পড়ে না ও বর্ত্তমান শাসন প্রণালীর দোষ গুণ কি তাহাও সম্যকরূপে জানিতে চাহে না। অর্থোপার্জ্জনে যে কিছু মস্তিষ্কের পরিচালনা আবশ্যক, দিবাভাগে কোন রূপে তাহাতে ব্যাপৃত থাকিয়া অপরাহ্নে দশ পাঁচজন একত্র হইয়া অক্ষক্রীড়ায় সেই দিবা ক্লান্তি দূর করিয়া সুখী হয়। শিক্ষা ও জ্ঞানে তাহারা যেন সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, আর এ জীবনে যেন তাঁহাদিগের কিছু শিখিবার কি জানিবার নাই।

“কাব্যশাস্ত্র বিনোদেন
কাল গচ্ছতি ধীমতাং
ব্যসনেন চ মূর্খানাং
নিদ্রায়া কলহেন চ”

তাহাদিগের সম্বন্ধে এইটী বলিতে পারা যায়। যাহা দোষ তাহা বলিলাম, এখন গুণের কথা বলি।

পশ্চিমবাসী বাঙ্গালীরা মুক্ত হৃদয়ে যত্নের সহিত অতিথি সৎকার করিয়া থাকে, সাধ্যমত দান করিতেও তাহারা কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহে এবং স্বজাতি ও আত্মীয়-গণের বিপদে তাহারা নিতান্ত চিন্তার সহিত ইচ্ছা পূর্ব্বক অর্থ সাহায্য করিয়া তাহাদিগকে বিপদ মুক্ত করিয়া সুখানুভব করে। কত প্রতারক দুঃখের রঞ্জিত ইতিহাস প্রস্তুত করিয়া অধিকাংশ সময়ই তাহাদিগের নিকট ভুলাইয়া অর্থ লইয়া যায়, কিন্তু তাহারা বারম্বার এ প্রকার প্রতারিত হইয়াও দানে বিমুখ নহে। কোনও আত্মীয় ব্যক্তি পীড়িত হইয়া তাহাদিগের গৃহে আশ্রয় লইলে চিকিৎসকের এবং ঔষধের অর্থ পর্য্যন্ত নিজে দিয়া থাকে ও তাহাতে অণুমাত্র ক্ষতি বোধ করে না। শত অসুবিধা সময় সময় সহ্য করিয়াও পরিচিত অপরিচিত অতিথির সেবা করিতে সতত উৎসুক থাকে। দেশের কাহাকেও দেখিলে যেন চরিতার্থ হইয়া যায়। মার্জ্জিত সহৃ-

দয় ভদ্রতা ও আপ্যায়িত ইহাদিগের নিকট শিক্ষা করা যাইতে পারে বলিলে কিছু বেশী বলা হইবে না। গৃহ বিচ্ছেদ (দলাদলি) ইহাদিগের মধ্যে থাকিলেও ইহারা বান্ধব-প্রিয় এবং দয়ালু।

এটোয়া সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু বলিবার নাই। এই প্রসঙ্গে পশ্চিমের অন্যান্য সামান্য যাহা জানিতাম, তাহা বলিয়াছি।

এটোয়া পরিত্যাগ।

ক্রমে শীতাবসান হইতে লাগিল; আমিও এটোয়া পরিত্যাগের চেষ্টায় থাকিলাম। তখন আমি সেনিটারী কমিশনারের ন্যায় উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন নগরের স্বাস্থ্য ও মৃত্যু সংখ্যার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। লক্ষ্ণৌ অযোধ্যা প্রভৃতি স্থানে প্রচণ্ড মারিভয় উপস্থিত হওয়ায় সেখানে রাজাজ্ঞায় যাত্রী সমাগম নিষিদ্ধ হইয়াছিল। আমিও বহু যত্ন ও ব্যয়ে পুনর্লব্ধ স্বাস্থ্য, বার্দ্ধক্য সুদূরবর্ত্তী জীবন পর্য্যটন বাসনা-মন্দিরে

বলিদান দিতে উৎসুক ছিলাম না, সুতরাং আমার ভ্রমণ-লোলুপ নেত্র এক দিকে নিবারিত হইয়া অন্য দিকে সঞ্চালিত হইতে বাধ্য হইল।

২৪শে ফেব্রুয়ারী, প্রত্যুষের ট্রেণে আমরা এটোয়া ত্যাগ করিয়া আগ্রাভিমুখে যাত্রা করি। প্রভাতে গাড়ী "তুণ্ডুলা" পৌঁছিলে সে গাড়ী ছাড়িয়া আগ্রার গাড়ীতে উঠিলাম এবং ৮৷৷০ ঘটিকার সময় আগ্রা গিয়া উত্তীর্ণ হইলাম। কতক পথ যাইতে না যাইতে অৰ্দ্ধ প্রকাশিত, অৰ্দ্ধ-লুক্কায়িত ভাবে নীলাকাশ স্পর্শ করিতে করিতে তাজমহলের ধবল প্রস্তর নির্ম্মিত অপূর্ব্ব দীপ্তিময়-শিল্প প্রভাকর করে উজ্জ্বল গৌরবে আমাদিগের দৃষ্টিপথে সহসা প্রতিভাত হইল, এবং সেই স্বপ্নময় স্মৃতিমাখা তাজের গগনস্পর্শী শ্বেত চূড়া কতক দেখিয়াই কেমন যেন এক মোহ স্বপ্নে ডুবিয়া গেলাম। আমি সে অবস্থা বর্ণনার চেষ্টা করিব না। চক্ষের সম্মুখে সকলি জীবন্ত চিত্র, অথচ যেন তাহা বহু দিন দৃষ্ট অতীত স্বপ্নবৎ ভাবপূর্ণ, স্মৃতিতে জাগিবে জাগিবে করিয়া জাগিতেছে না; দেখিতে পাওয়া যাইতেছে সব, কিন্তু

ছুঁইতে কি ধরিতে ক্ষমতা নাই। দূর হইতে সেই মানসমোহন তাজমহলের শিখরমালা নিরীক্ষণ করিয়া কত আশার কথা, কত নিরাশার অশ্রু হৃদয়কে সুখে দুঃখে হাসি কান্নাময় করিয়া ফেলিল,—আমি আমাকে তখন ভুলিবার জন্য অন্যমনা হইবার প্রয়াস পাইলাম, এমন সময় উদার সৌন্দর্য্য-পূর্ণ সুবিস্তৃত যমুনা সেতু দেখিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে তাজমহল ভুলিয়া গেলাম এবং "যমুনা লহরী" সঙ্গীতের "নির্ম্মল সলিলে বহিছ সদা, তটশালিনী সুন্দর যমুনে ও" ভাবিতে ভাবিতে সেতু পার হইলাম।

আমরা গাড়ী হইতে নামিয়া পথভ্রান্ত পথিকপ্রায়, ক্লান্তভাবে, কোথায় যাইব, কি করিব ভাবিয়া (Overland) সেতুর উপর কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। তখন একজন হিন্দুস্থানী, বর্ণে কাফ্রী বিনিন্দিত, নাসিকায় চীনবাসী লজ্জা পায়, স্বশরীরে আসিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া একখান খাতা দেখাইল। তাহাতে অনেক বাঙ্গালী যাত্রীর পরিচিত নাম দেখিয়া আমরাও তাহার গৃহে বাসা লইতে স্বীকৃত হইলাম।

তার গৃহে যাইবার সময় পথি-মধ্যে কয়েকটী স্ত্রীলোক সহসা আসিয়া আমাদিগকে যেন ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা করিল। তাহারা ইতর স্ত্রীলোক, বিদেশী পথিকদিগকে প্রলোভন দেখাইয়া আগে নিজ গৃহে লইয়া যায় ও পরে যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করে। আমরা বহু কষ্টে সেই মায়ারূপিনী রাক্ষসীগণের হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়া পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির গৃহে বাসা লইলাম।

আমরা যে গৃহে বাসা লইয়াছিলাম, তাহা দ্বিতল ও যমুনা নিকটস্থ রাজ পথবর্ত্তী। পথশ্রান্তির পর তাহা পরিপাটী এবং নয়ন-তৃপ্তিকর বোধ হইল।

আমরা আসিবা মাত্র কিরূপে যে সেই সংবাদ আগ্রাবাসী ফেরিওয়ালাদিগের মধ্যে টেলিগ্রাফ হইল, সে রহস্যভেদ করিতে এখনও পারি না। অল্প কালের মধ্যেই তাহারা ঝাঁকে ঝাঁকে আসিতে লাগিল ও নানা প্রকার কারুকার্য্য বিশিষ্ট বিবিধ প্রস্তর সামগ্রী বিক্রয়ার্থে আনিয়া মন ভুলাইতে লাগিল। সেই সকল সুন্দরতর শিল্পকার্য্য দেখিয়া মন আনন্দে পরিপ্লুত হইয়া যায়। তবে তাহার অসম্ভব মূল্য শুনিয়া দীনহীনের

হর্ষ বিষাদে পরিণত হইয়া থাকে। ধর্ম্মভয়-বিরহিত চালাক ফেরিওয়ালাগণ সর্ব্বত্রই সমান। সেই বিক্রেতাদিগের মধ্যে কেহ কেহ আবার অপেক্ষাকৃত কিছু বেশি বুদ্ধিমান্। তাহারা বিক্রীত দ্রব্যের সহিত অনেক বড় লোকের নামও মস্তকে বহন করে এবং বাঙ্গালী দেখিলে তাহা বিজয় নিশান স্বরূপ দর্শন করাইয়া থাকে। তাহাদিগের সেই পণ্য দ্রব্যের অংশ রূপ নামাবলীর মধ্যে প্রত্নতত্ত্ববিৎ শ্রীযুত রাজেন্দ্র লাল মিত্র মহাশয়ের নাম দেখিলাম। কিন্তু তাহাতে দাম কমিয়া দ্রব্যক্রয়ের কোনই সুবিধা হইল না। তখন ভাবিলাম, "স্বদেশীয় (এণ্টিকোয়েরিয়ান) পণ্ডিত ব্যক্তির নামে বিদেশে সুলভ মূল্যে কিছু পাওয়া যায় না, বরং বড় লোকের রেটে গরিবরা অনেক সময় মারা যায়।" দূর প্রবাসে স্বজাতির পণ্ডিত ব্যক্তির অপরিচিত নিদর্শন, হস্তাক্ষর দেখিয়া, সত্যই বড় আনন্দিত হইয়াছিলাম। তাহা দেখাইয়া যে বিক্রেতাগণ আমাদিগকে ঠকাইতে পারে নাই, সে জন্য এখনও সন্তুষ্ট আছি। আমরা আহারান্তে সেই

দিনই আগ্রানগরী, তাজ এবং যমুনার শোভা দেখিবার জন্য বাহির হইলাম।

অগ্রবন।

(আগ্রা)

অগ্রবন মোগল বাদসাহদিগের সময়ের মহা সমৃদ্ধিশালী রাজধানী ও হিন্দুদিগের একটী তীর্থ, মথুরা বৃন্দাবনের চৌষট্টি ক্রোশের মধ্যে যে সকল স্থান আছে, সে সমুদায় তীর্থ মধ্যে পরিগণিত এবং তাহাদের অগ্রবর্ত্তী বলিয়াই আগ্রার প্রাচীন নাম অগ্রবন। ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ এখানেও বিহার করেন, তাহাতেই তীর্থযাত্রী বৈষ্ণবগণ রীতিমত পূর্ব্বে অগ্রবন পরিদর্শন ও যমুনায় স্নানাদি করিয়া শেষে মথুরা বৃন্দাবন যায়। আমরা তীর্থ-যাত্রী না হইলেও, আগে অগ্রবন দর্শন করি, তবে যমুনায় স্নান করিবার সৌভাগ্য আমার ভাগ্যে ঘটে নাই।

যমুনার তীরোপরি সৌষ্টবময়ী শ্রী-সম্পন্না "সুন্দরীতরা" প্রস্ফুটিতা নগরী আগ্রা আলেখ্যবৎ বিরা-

জিতা। তাহার অতুলনীয় "ধবল সৌধছবি" নীল সলিলে আপনার মুখ আপনি দেখিয়া দেখিয়া যেন প্রতিবার মুগ্ধ হইয়া যাইতেছে। সেই প্রতিবিম্বিত রূপরাশি "মরি মরি কোন বিধাতা গড়িয়া ছিলরে।" দর্শকের চিত্তমুগ্ধকর সে শোভার কথা কিরূপে ভাষায় প্রকাশ করিব ?

অসংখ্য জনস্রোত আগ্রার বৃহৎ প্রস্তরময় রাজপথে অবিরাম প্রবাহিত হইতেছে, তাহার বিরাম নাই, কেবলি কলরব ও মনুষ্যমস্তক শুনিবে এবং দেখিবে মাত্র। সেই কঠিন শিলাময় ধূলিরঞ্জিত রাজবর্ত্মে পদব্রজে বাহির হওয়া সুখকর ব্যাপার বোধ হয় না।

আগ্রার বিপণীগুলি পরিপাটী রূপে সুসজ্জিত এবং প্রস্তরের কারুকার্য্যের দোকান সকল নয়নপ্রীতিকর। পথিকগণ রাজ পথে চলিতে চলিতে অনেক সময় অনন্যমনে সেই স্থানে দাঁড়াইয়া যায় ও তাহা দেখিয়া যেন পথক্লান্তি দূর করিয়া থাকে।

তাজ।

যখন অস্তগামী অংশুমালীর কনক-কিরণে পশ্চিমাকাশ অনুরঞ্জিত, সেই হৈম রশ্মিকণা যমুনার নীলবক্ষে মৃদুল তরঙ্গে কখন ভাসিয়া, কখন ডুবিয়া জলক্রীড়া করিতেছিল, যমুনা-হৃদয়ে সেই কিরণমালার লুকোচুরী খেলা—শোভার মাধুরী নয়ন ভরিয়া দেখিতে দেখিতে দিবাবসানে আমরাও তাজমহলের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলাম।

ইতিহাসে ও বন্ধু প্রমুখাৎ আশৈশব শ্রবণ করিয়া এবং কল্পনা নেত্রে নির্জ্জনে কখন কখন দেখিয়া তাজমহল যেন আমার চিরপরিচিত হইয়া গিয়াছিল। সেই কল্পনা-জাত মানসচিত্র তাজমহল, এখন আবার তাহার সেই অপূর্ব্বশরীরী মাধুরীময় ছবি, সেই সর্ব্বজন-মনোমোহন মূর্ত্তি চক্ষুর সম্মুখে জীবন্ত হেরিয়া হৃদয় কেমন যে হইয়া গেল, সৌন্দর্য্য-মুগ্ধ আমি স্তম্ভিত ও অবাক হইয়া গেলাম এবং মুহূর্ত্ত মাত্র শূন্য দৃষ্টিতে সেই অনন্ত শোভাপূর্ণ অমরাবতী সম প্রণয়-সমাধি সৌধের কারুকার্য্য নিরীক্ষণ করিয়া আত্মহারা

হইয়া কি যেন ভাবিতে লাগিলাম! সে স্মৃতিময় চিন্তা শৈশবের সুখস্বপ্নের মত অস্ফুট নহে। প্রকৃত প্রণয়ের প্রথম দৃষ্টির ন্যায় তাহা মধুময়, প্রিয়তমের প্রেম-সম্ভাষণের ন্যায় তাহা প্রাণস্পর্শকর, ললিত সঙ্গীত অনুভবে আজিও তাহা হৃদয়ে সজীবতা আনিয়া দেয়। সে স্মৃতি ভুলিবার নহে। পৃথিবীতে "সাতটী আশ্চর্য্য দ্রব্য" আছে, আমার ভাগ্যে অন্য গুলির দর্শন না ঘটিলেও, তাজমহলকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিতে যেন ইচ্ছা করে। কঠিন প্রস্তরে ললিত সঙ্গীত, ভাবুকজন-হৃদয়ে আশার হাস্য, প্রণয়ের স্বপ্নময়-সুখদ-সম্মিলন এবং শিল্পের চরমোৎকর্ষ অপূর্ব্ব শিলায় একত্র সন্নিবেশিত দেখিয়া, কে না ক্ষণকালের নিমিত্ত, এই রোগ শোক দুঃখ বিজড়িত পার্থিব জগৎ এবং মনুষ্যজীবনের গত নৈরাশ্যের যন্ত্রণা ভুলিয়া যাইবে?

মৃতপত্নীর প্রণয়-স্মৃতি ইহ জগতে চিরস্থায়ী করিবার জন্য এই অমূল্য, অতুলনীয় তাজ (সমাধি) নির্ম্মিত হইয়াছে। অপরিমিত অর্থ, অক্লান্ত পরিশ্রম এবং শিল্পের চরমোৎকর্ষ ইহাতে পর্য্যবসিত হইয়া গিয়াছে।

তীর্থস্থানে কোন মহাপুরুষ কিম্বা কোন দেবমূর্ত্তি দর্শন করিবার নিমিত্ত পর্ব্বদিনে যেমন জনসমাগম হইয়া থাকে, তেমনি প্রতিদিন প্রদোষে এই অমর সমাধি দর্শনার্থে অগণ্য লোক একত্র দেখিতে পাওয়া যায় ও বারেক মাত্র সকলে যেন ইহার শোভা দেখিয়া নয়ন সার্থক জ্ঞান করে। প্রদীপ্ত চন্দ্রালোকে তাজ দেখিতে আরো মনোহর।

তাজমহলের অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া জনৈক ইংরাজ মহিলা একটী কবিতায় লিখিয়াছিলেন যে, "তুমি নারী কুলে ভাগ্যবতী তাই এই স্বর্গীয় রশ্মি-মালাবিনির্ম্মিত তাজ তোমার সমাধিমন্দির, তুমিই পতি-সোহাগিনী, তোমার ন্যায় ভাগ্য এজগতে কাহার আর ?" কিন্তু আমি তাজ দেখিয়া এত যে মোহিত হইয়াছিলাম, স্বর্গের স্বাপ্নিক মাধুরী যেন প্রস্তরে বিকশিত দেখিলাম বোধ হইল,—তথাচ আমি মনে করি, প্রকৃত অকৃত্রিম অপার্থিব পবিত্র প্রণয় এই সুন্দর মহান সমাধি-সৌধ তাজ অপেক্ষা সুন্দরতর, মহত্ত্বতর ও অনন্ত সজীব। প্রকৃত এবং অমর প্রণয়ের

গৌরবে অযুত অযুত তাজ নিমগ্ন ও বিলীন হইয়া যায়। যে প্রণয়ে নাস্তিক হৃদয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও পরলোকে বিশ্বাস, ব্রাহ্মে পৌত্তলিকতা এবং ইহ জীবনেই অনন্ত অক্ষয় জীবন্ত স্বর্গ আনয়ন করে ও যে প্রেমে দুই পৃথক আত্মা একত্রীভূত হইয়া পরমাত্মাতে শেষে সম্মিলিত হয়, ও একের অস্তিত্বে অন্য জীবন ধারণ করে, সে প্রণয়ের স্মৃতি চিরস্থায়ী করিবার জন্য কোন পার্থিব সমাধির যে প্রয়োজন আছে, আমি ত তাহা বুঝিতে পারি না। এক জনের মৃত্যুতে অন্য একজন জীবিতে, ইহলোকেই যাহার জীবন্ত সমাধি হইয়া থাকে, সেই অপার্থিব প্রেমের অবিনশ্বর সমাধির স্থান এ অনন্ত বিশ্ব নহে। তাজমহল স্বরূপ অলৌকিক সমাধিমন্দির দেখিয়াও তাহার অভ্যন্তরে চিরনিদ্রিতা সাজাহান প্রেয়সী মহিষীকে "নারীকুলে ভাগ্যবতী" কিম্বা "পতি সোহাগিনী" বলিয়া আমি কখন মনে করি না।

তাজ দেখিয়া অনেক ইংরাজ ভ্রমণকারী নানা প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন, সে সকল এস্থলে

উল্লেখ করিবার কোন প্রয়োজন নাই—কিন্তু কিছুদিন হইল একজন ইংরাজ, Statesman পত্রিকায় ঐ বিষয় সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে বেশ একটু নূতনত্ব ও সার আছে এবং আমি তাঁহার মত সম্পূর্ণ সহানুভূতির সহিত গ্রহণ করিয়াছি।

সাজাহান আপন সুন্দরী প্রিয়তমা রমণীর সমাধি-হর্ম্ম্যে অগণ্য অর্থ ঐ প্রকারে ব্যয় না করিয়া, যদি তাহার স্মরণার্থে, তাঁহার নামে কোন পতিতাশ্রম, পান্থশালা কিম্বা কোন শিক্ষালয় স্থাপন করিয়া যাইতেন, তাহাতে তাঁহার কীর্ত্তিময় উপকার জগতে যেমন চিরস্থায়ী ও স্মরণীয় হইত, ইহাতে সে প্রকার কিছু হয় নাই। কখন কোন পথিক দর্শক, অথবা কোন ভ্রমণকারী একদিন মাত্র তাজ দেখিয়া যে সুখ পায়, তাহা অকিঞ্চিৎকর! তাজমহলের দ্বারা সংসারের অন্য কোনই উপকার দেখি না। ইহাকে হৃদয়-বিহীন সুন্দর সজ্জিত পাষাণময়ী দেব প্রতিমার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে, কারণ, বাহিরে তাহার অতুল শোভাময় হেম—কিরণবৎ মাধুরী ঝরিয়া

পড়িতেছে যেন দেখিয়া মনে হয়, অঙ্গুলী দ্বারা স্পর্শ করিতে সাহস হয় না, বোধ হয় যেন মনুষ্যের কর স্পর্শে তাহার দেবত্ব, কমনীয় কান্তি মলিন হইয়া যাইবে, "ছুঁইলে নখের কোণে বিষম বাজিবে প্রাণে" ভাবিয়া কোমল স্নেহের করেও স্পর্শ করিতে প্রাণে ব্যথা লাগে, কিন্তু তাহার হৃদয় মাঝারে মৃত শরীর সমাধি-শয্যায় প্রোথিত রহিয়াছে, ভাবিলে, কল্পনায়ও মন বিষণ্ণ হইয়া যায়। বাহিরের চাকচিক্যে ভিতরের মলিনতা দূর হয় না। অমিশ্রিত পবিত্রতা অতীব উপাদেয় এবং অপার্থিব।

তাজমহলের ভিতর প্রবেশ করিবার সময় মুসলমানগণ জুতা পরিহার করিতে বারম্বার অনুরোধ করে এবং কখন বা হীনজন দেখিলে কিছু কর্কশতা প্রদর্শন করিয়া থাকে। কিন্তু শ্বেতপদের সর্ব্বত্র সমান সম্মান ও অধিকার, মানবের সমাধি-মন্দির-প্রবেশে দেবজাতি পাদুকা ত্যাগ করিবে কেন? এই পাদুকা রহস্য অবলম্বন করিয়া সেই স্থানীয় মুসলমানেরা বিষণ্ণ ভাবে যাহা বলে, তাহার অর্থ,—

"বৃটিষ সিংহের বিকট বদন,
না পারি নির্ভয়ে করিতে দর্শন,
কি বাণিজ্যকারী অথবা প্রহরী—
জাহাজী গৌরাঙ্গ কিবা ভেকধারী,
সম্রাট ভাবিয়া পূজি সবারে।"

তাজমহল, তাহার সম্মুখস্থ রমণীয় পুষ্পোদ্যান এবং তাহার হৃদয়ে কৃত্রিম উৎস একে একে নয়ন ভরিয়া অবলোকন করিয়া পরিশেষে আমরা সায়াহ্ন সমীরণ সেবন করিতে করিতে পরপারের মন্দির ইসলামদৌলা (ইহার প্রকৃত উচ্চারণ আমি জানি না, সেখানে যাহা শুনিয়াছি, তাহাই লিখিলাম) গিয়া পৌঁছিলাম। এই রম্য হর্ম্ম্যের প্রস্তরময় ভিত্তি যমুনা-বক্ষে প্রোথিত। আগ্রার সৌধমালার প্রত্যেকটীর এমন এক অপরূপ সৌন্দর্য্য আছে যে, তাহার কোন্‌টী রাখিয়া কোন্‌টী দেখিব, তাহা অনুমান করা যায় না। বাদসাগণ এই ইসলামদৌলার প্রশস্ত উচ্চ প্রোথিত প্রাঙ্গণে বসিয়া প্রদোষে যমুনার জলক্রীড়া দর্শন করিতেন। সেই অনৈসর্গিক রূপরাশি যমুনা, যখনি দেখা যায় তখনি মন আহ্লাদে পরিপ্লুত হইয়া থাকে, বটে, কিন্তু

সৌন্দর্য্যময়ী নীলবর্ণা যমুনা বর্ষাকালে যখন পূর্ণাঙ্গিনী হইয়া রূপভরে উছলিয়া পড়ে, তৎকালে তাহার সেই তরঙ্গায়িত পূর্ণ মাধুরী কল্পনাতীত শোভা ধারণ করে। অতীতের স্বাক্ষী-রূপিণী "লীলাময়ী যমুনার তরঙ্গ" নিচয় দর্শন করিয়া অনেক বিষাদময়ী চিন্তার আঘাত আমার হৃদয়ে লাগিয়াছিল।

উৎসব দিবাবসানে, প্রিয়জন প্রবাস-গমনে, বিজয়া-দশমীর দিনে, নির্জ্জন গৃহে একক নিশীথে হৃদয় যেমন এক প্রকার অবসাদ ও পরিত্যক্ত ভাবে নৈরাশ্যের অন্ধকারে নিমগ্ন হইয়া যায় ও সুখময় ভূত স্মৃতি কেবল মাত্র শূন্যতা আনয়ন করে, যমুনার তীর ছাড়িয়া আমার মনও সেই প্রকার কেমন এক অবসন্ন ভাবে বিষাদে ডুবিয়া গিয়াছিল। অশান্তির স্বপ্নময় ভাঙ্গাভাঙ্গা নিদ্রায় দীর্ঘ রজনী অতিবাহিত করিলাম। সুখ দুঃখ উভয়ই সময়ে চলিয়া যায়, তাহার স্মৃতিমাত্র আমরা আজীবন অন্তরে বহন করি। এস্মৃতিও চির-দিন আমার হৃদয়ে জাগরূক থাকিবে।

দুর্গ।

পরদিন অরুণোদয়ে শয্যা ত্যাগ করিয়া আমরা আগ্রাদুর্গ প্রবেশার্থে "পাস" সংগ্রহে ব্যস্ত হইলাম। বিশ্রাম বারে (রবিবার) ইংরাজের আফিস ইত্যাদি বন্ধ, সুতরাং পাস পাইতে সে দিন একটু পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিতে হইল। শুনিলাম, সেখানকার Brigadier General লোক ভাল, ভদ্রলোকের সম্মান রাখিয়া থাকেন। আমরা তাঁর কর্ম্মচারীগণের নিকট পাস পাইলাম। আমরা দুর্গ ইত্যাদি দেখিবার জন্য বেলা প্রায় দ্বিতীয় প্রহরের সময় বাসা পরিত্যাগ করিলাম। প্রথমে দুর্গদ্বারে প্রবেশ করিবামাত্র জনৈক সজ্জিত শিক সৈনিক আমাদিগের পাস দেখিতে চাহিল। আমাদের গাড়ীর বাহিরে General সাহেবের চাপরাশি ছিল, সে মুখে পাস আছে কহিয়া অন্য-দ্বারে গাড়ী লইয়া গেল। আমরাও সেই স্থানে গাড়ী হইতে নামিলাম। দিবা দ্বিপ্রহরে পশ্চিমের আতপ তাপে দগ্ধ হওয়া বড় সুখকর নহে। প্রস্তরময় ভুমি,—অগ্নিবৎ, পদতল তাহাতে নিষ্ঠুর ভাবে দগ্ধ

করিয়া এবং প্রচণ্ড সূর্য্যকর মস্তকে ধরিয়া পুড়িতে পুড়িতে তখন দুর্গের মধ্যে যাইবার নিমিত্ত দ্বিতীয় দ্বারে গিয়া দাঁড়াইলাম। সেখানে একজন গোরা সৈনিক পাহারায় বসিয়াছিল, সে আবার পাস "তলব" করিল। এবার ত আর মুখের কথায় চলে না, এবার তা দেখাইতে হইল। সে তাহা সম্রাট সম প্রভুত্বের সহিত মঞ্জুর করিলে আমরা দুর্গ মধ্যে যাইতে পারিলাম।

আগ্রা-দুর্গ হৃদয়ে আর একটী চিত্রিতা সুন্দরী নগরী যেন শোভা পাইতেছে। তাহার মনোমোহন সৌন্দর্য্য, তৃপ্তিকর চারুতা দেখিয়া কতক্ষণ চাহিয়া থাকিতে হয়। অচেতন সৌন্দর্য্য, সচেতন জীবের প্রাণে কত আনন্দ দেয়। ইংরাজ সৈনিক পুরুষ-দিগের বাসগৃহগুলি এই দুর্গের ভিতর এবং তাহা অতি পরিপাটী ও পরিষ্কার। প্রাঙ্গণে সুস্থকায় প্রফুল্ল স্বাধীন—প্রকৃতি ইংরাজ বালক বালিকাগণ আনন্দে ক্রীড়া করিতেছে—যেন শকুন্তলা-সুত সিংহ-শিশুর কেশর ধরিয়া বিক্রমে খেলিতেছে—এমনি স্বাধীন ও

জীবন্ত ভাব। ভারতের অতীত দিনে বীরপুত্রগণ যেরূপ করিয়া ক্রীড়া করিত, তাহা কেবল পুরাণ এবং ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু এই বালক-দিগের স্বাধীনতাময় খেলায় ও নির্ভীকতায় ভূত কালের আর্য্যভাবের চিহ্ন কিছু রহিয়াছে মনে হয়। দাসপুত্রগণ জন্মিয়াই মাতৃদুগ্ধের সহিত ভীরুতাই যেন পান করিয়া থাকে, এবং বালকের খেলাতেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। জন্মিয়া যে অধীনতার আঁধারে পরিবর্দ্ধিত হয়, বয়সে জ্ঞান সহকারে তাহা পরিহার করিতে পারে না। শাস্ত্রে আছে, "স্ত্রীজাতি বাল্যে পিতা, যৌবনে পতি এবং বার্দ্ধক্যে পুত্র কর্ত্তৃক রক্ষিতা হইবেন। নারী কখনই স্বাধীনা নহেন।" কিন্তু আমার বোধ হয়, বাঙ্গালী পুরুষ সম্বন্ধে রূপান্তর করিলে এ শ্লোক কতক খাটে, যেমন বাঙ্গালী পুরুষ শৈশবে দিদিমার নিকট রহিয়া, কৈশোরে পাঠারম্ভে জননীর অন্তরালে থাকিয়া এবং যৌবন সমাগম হইতে বৃদ্ধ-কাল পর্য্যন্ত গৃহিণীর অঞ্চল ধরিয়া আপনাকে রক্ষা করিয়া থাকেন। পত্নীর নিকট মন্ত্রপূত হইয়া বীরত্ব

প্রকাশের যাহা কিছু অবসর (অনেকের পক্ষে) আশ্রিতা অনাথিনী বিধবা ভগিনী কিম্বা ভ্রাতৃজায়া অথবা বৃদ্ধা পিসী মাসী প্রভৃতির উপর, নতুবা বীর বাঙ্গালী চিরকালই অন্যের দ্বারা রক্ষিত। আফিসে প্রভুর অপমানের বিনিময়ে কিরূপে হাত তুলিতে সাহসী হইবেন? সে ত আর তাঁহাদের কোন দোষ নহে, কলির শাস্ত্রই তাঁহারা সকল বিষয়ে মানিয়া থাকেন!

পূর্ব্বে যেখানে বাদসাহদিগের বিলাসভূমি ও আরাম নিকেতন ছিল, আজি সেখানে বিদেশীয় সামান্য সৈনিকগণের বাস,—ইহা দেখিলে ভবিষ্যৎ যে চির অজ্ঞাত ও ধন, সম্পদ, মান, সম্ভ্রম যে কেবল মাত্র কথার কথা, ইহাই মনে হয়। যে জীবনের শেষ চিহ্ন শ্মশান-মৃত্তিকায় কিম্বা সমাধিতলে, তাহারই জন্য এত হিংসা দ্বেষ বা পরনিন্দা কেন?

"মতি মস্‌জিদ" ও অন্যান্য প্রাসাদ গুলিও এই দুর্গের মধ্যে অবস্থিত। "মতি মস্‌জিদ" মোগল বাদ-সাহগণের পারিবারিক ভজনালয়, ইহাও মর্ম্মর বিনি-

র্ম্মিত, এবং দেখিতে যেমন মনোহর, তেমনি মূল্যবান্ প্রস্তরে পূর্ব্বে ভূষিত ছিল। এখনও তাহার সেই রাজকীয় গৌরবের কতক কতক নিদর্শন রহিয়াছে, কিন্তু সে স্বজনতা আর নাই। সমাধিমন্দির অমরাবতীসদৃশ নিরুপম শোভান্বিত হইলেও, তাহার জীবনশূন্য পরিত্যক্ত ভাবে দর্শকের চিত্তরঞ্জন করিতে পারে না। যখন বন্ধু বান্ধব পরিবেষ্টিত হইয়া উপাসনালয়ে বাদসাহগণ "নমাজ" করিতেন, সে এক দিন, আর আজ এ এক দিন। সময়ের সর্ব্বসংহারক মূর্ত্তি কি ভয়ানক! যাহা যায়, তা আর ত ফিরিয়া আইসে না। থাকে কেবল—শোকের হাহাকার দৃশ্য!

বাদসাহদিগের সায়াহ্ন সমীরণ-সেবন-স্থান কেমন পূর্ব্ব আরাম স্মরণ করাইয়া দেয়। এইখানে বসিলে যমুনার লীলাময়ী শোভা মুক্তভাবে নয়নে প্রতিভাত হইয়া থাকে। আমরা ঘুরিতে ঘুরিতে যেই এইখানে আসিয়া দাঁড়াইলাম, কে যেন—

"যাদুকর দণ্ডসম পরশি হৃদয়,

স্থজিয়া নূতন ভব
শত দৃশ্য অভিনব
নয়ন সমীপে আজি ধরিল আমার” – কিম্বা সধার।

প্রদোষের সূর্য্যকরে যেন জগৎ নূতন এক পরিচ্ছদে আমাদের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল। আমরা তখন কি ছাড়িয়া কি দেখিব, বুঝিতে পারিলাম না। সম্রাট আকবর সকল ধর্ম্মের প্রতি ভক্তিপরায়ণ ছিলেন। শুনিলাম, তিনি নাকি এই প্রাসাদের উপর দাঁড়াইয়া অস্তগামী রবিকরে মথুরার দেব মন্দিরের চূড়াদর্শন করিতেন। একথা কতদূর সত্য, তাহা জানি না; তবে এখান হইতে অপরাহ্ণে নিমীলিত দিবাকরে মথুরার দেবালয়ের চূড়া বেশ পরিষ্কার দেখা যায়। জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে যমুনা-হৃদয়-স্পর্শকারী শীতল বায়ু সেবন করিতে করিতে সম্রাটগণ এইখানে বসিয়া নর্ত্তকীকণ্ঠ-বিনিঃসৃত মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিতেন।

এখানে দুইখানি “তক্ত” প্রস্তরাসন আছে। কৃষ্ণবর্ণ শিলাসনে স্বয়ং বাদসাহ ও শ্বেতাসনে বীরবল (মন্ত্রী) বসিয়া কখন কখন নিশীথে গুপ্ত দরবার করি-

তেন। সেই দুইখানি আসন বহুদিন রৌদ্রতাপে দগ্ধ হওয়াতে, কিম্বা যে কারণে হউক, বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে; এবং সম্রাটের কৃষ্ণাসনের মধ্যে একটা দাগ পড়িয়াছে; কিন্তু সম্পূর্ণ ভাঙ্গে নাই। তবে প্রবাদ এই যে, ইংরাজ কোম্পানী পলাসির যুদ্ধে বিজয়ী হইয়া যখন আগ্রায় আসিয়াছিলেন, তখন নাকি দুর্গের মধ্যে এদিক সেদিক বেড়াইয়া শেষে এই আসন দেখিতে আসিয়া, সম্রাটের প্রভুত্বের পরিচয় স্বরূপ এই তক্তে এক লম্ফে আরোহণ করেন। তাই ইংরা-জের ("লাথ" লাগিয়া) পদস্পর্শে অভিমানে কৃষ্ণাসন ফাটিয়া যায়। তাহার মধ্যে যে রক্ত বর্ণ দাগ পড়ি-য়াছে, তাহা অভিমানী শিলার বিদীর্ণ হৃদয়ের শোণিত চিহ্ন; প্রস্তরের লাল বর্ণ নহে! এই ভ্রমময় প্রবা-দের প্রতিবাদ করিলে আগ্রাবাসী সামান্য মুসলমান-গণ বড় দুঃখিত হয়। দিল্লীর দরবার ইত্যাদির কথা তুলিয়া নানা প্রকারে অত্যাচার প্রমাণ করিতে শেষে প্রয়াসী হইয়া থাকে।

"শীশমহল" (আয়নার প্রাসাদ) বেগমদিগের চারু

নিকেতন। ইহার বাহিরের ভিত্তি চুণী "পান্না" দ্বারা বিভূষিত এবং ভিতরের সমুদায় প্রাচীর খণ্ড খণ্ড আয়-নাতে বিমণ্ডিত। প্রতি প্রকোষ্ঠ এমন মনোহর, দেখিলে যেন কল্পনায় ইন্দ্রালয়ের চিত্র মানসে সমু-দিত হয়। এই গৃহেই একজনের প্রণয়াভিলাষিণী শত মহিলা পৃথক পৃথক ভাবে বাস করিতেন। এমন উপাদেয় রম্য প্রাসাদে, শত সহস্র পরিচারিকা সেবিতা ও পরিবেষ্টিতা মহিষীগণ যে নিরুপম সুখে কালাতিপাত করিতেন, ইহা আমার বিশ্বাস হয় না। চিররুদ্ধ ভাবে, স্বর্ণ শৃঙ্খল পরিয়া পরাধীন জীবনে নিশীথ-কল্পনায় মাত্র প্রণয়-সুখ অনুভব করিয়া তাঁহারা কখনও যে সরল প্রাণে হাসিয়াছেন, তাহা কে বলিবে? একজন মাত্র সপত্নী-শঙ্কা নারী জীবনের দারুণ যন্ত্রণা ও বিষম কণ্টক, আর সজীবিতা শত প্রতিযোগিনী সপত্নীসহ একত্র বাস, কি ভয়ানক ব্যাপার!!! সে কলহময় ঈর্ষান্বিত সহবাসে স্বর্গও নরক স্বরূপ পূতি-গন্ধময় অসহনীয় হইয়া উঠে। তবে যদি "দেবী চৌধুরাণী"র শিক্ষা সদৃশী শিক্ষা গুণে তাহাদিগের

সপত্নীর বিষময়ত্ব দূরীকৃত হইয়া থাকে, তাহা বলিতে পারি না।

বেগমগণের প্রাসাদের নিম্নতলে তাঁহাদিগের "বাঁদী"রা থাকিত। সে স্থান অতি শোচনীয়। সূর্য্য-কর দিবা দ্বিপ্রহরেও ভুলিয়া সেখানে যাইত কি না, সে বিষয়ে সমূহ সন্দেহ আছে। রৌদ্র বায়ু পরি-বর্জ্জিত সেই গৃহে বাস এবং কখন কখন বেগমসাহেব-দিগের সেবার অনুমাত্র ত্রুটি হইলে আবার তাহার পার্শ্বস্থ অন্ধকূপে দণ্ডস্বরূপ কয়েদ থাকিয়া তাহারা যে মনুষ্য জীবনের প্রতি অনুরাগিনী ছিল, তাহা ত সহজে অনুভব করা যায় না। তবে তাহাদের মনে একমাত্র সান্ত্বনা ছিল যে, তাহারা কেহ সুন্দরী হইলে যৌবন-বসন্তে দাসীর অবস্থা হইতে রাজ্ঞীর পদে "প্রমোশন" (Promotion) পাইবে। সেই এক আশায় ক্রীত দাসীরা বাল্যকাল হইতে এই গৃহে সুখের স্বপ্ন দেখিলেও অন্ধ কূপের দৃশ্য তাহারা কখনই বিস্মৃত হয় নাই। ইতিহাসবেত্তা এলিসন বলেন যে, "সার-কেসিয়ার কুমারীগণ শৈশব হইতেই প্রাচীন ধনী

বৃন্দের অবরোধবাসিনী হইবার জন্য শিক্ষিতা হইত এবং ভাবী সুখের আশা তাহাদিগের পিত্রালয় পরিত্যাগের দুঃখ মন্দীভূত করিত।” তিনি আরো বলেন,—“পশ্চিম ইউরোপের সুন্দরী যুবতীগণের পক্ষে নাট্যশালা যেমন প্রীতিকর, বাদসাহ কিম্বা ধনীগণের অবরোধও (harem) নাকি অবরোধবাসিনীগণের নিকট সেইরূপ সুখ নিকেতন বলিয়া প্রতীত হইত।” বলিতে পারি না,—“পর চিত্ত অন্ধক’র”—সত্যই ক্রীত দাসীগণ কল্পনাজাত সুখের আশায় প্রকৃত জীবনে কখনও সুখানুভব করিয়াছে কিনা। পূর্ব্বে এই দুর্গের প্রাঙ্গণে অতি রমণীয় পুষ্পোদ্যান ছিল। কাশ্মীর, ইস্পাহান, পারস্য প্রভৃতি দেশজাত ও বহু ব্যয়ে আনীত বিবিধ উপাদেয় স্বর্গীয় গোলাপ ও নানাবিধ মনোহর কুসুমে তাহা নন্দনকাননবৎ শোভায় বিরাজিত ছিল। যেমন অন্তঃপুরে অলৌকিক লাবণ্যময়ী মহিষীগণ, তেমনি এ উদ্যানে দুর্ল্লভ ফুল্ল কুসুমরাজি। যমুনা শীকরবাহী সমীরণ, তাহার প্রাণভরা মুক্ত সৌরভ অনিবার বহন করিয়া আগ্রার দ্বারে দ্বারে বিতরণ

করিত। আজি সেই নন্দনকানন অন্ধকার, গুটিকত বিলাতী ফুলে,—"ফিঁকে ভায়লেট গন্ধ নাহি তাহাতে" তাহাকে পুষ্পোদ্যানে অবিহিত করিতেছে। শত শত কৃত্রিম উৎস, সুবাসিত বারিপূর্ণ প্রাণে, উথলিত হৃদয়ে যেখানে ক্রীড়া করিত, এখন সেখানে জলকণার চিহ্নমাত্র নাই। বিশুষ্কভাবে সকলি পূর্ব্ব সৌভাগ্যের সহিত বিলীন হইয়া গিয়াছে!

বেগমদিগের স্নান-হর্ম্ম্য অতীব রমণীয়। তাহার প্রাচীর রজতনিভ দর্পণখণ্ডে পরিশোভিত। স্নানের নিমিত্ত ইহার ভিতর একটী বৃহৎ কৃত্রিম সরিৎ এমন কৌশলের সহিত প্রস্তুত করা হইয়াছে যে, আপনা হইতে যমুনার সুশীতল পূত বারি তাহাতে অনায়াসে আইসে এবং একজন ব্যক্তি সুখে ভাসমান হইয়া সেই তরঙ্গবিহীন সরিৎসাগরে অবগাহন করিতে পারে। সেই হর্ম্ম্যস্থ সরিৎ লাবণ্য ছটায় আলোকিত করিয়া, নিদাঘ মধ্যাহ্নে অসূর্য্যম্পশ্যরূপা ভুবনজ্যোতি নুরজাহান কিম্বা রূপসীপ্রধানা যোধবাই যখন আপন আপন সৌন্দর্য্যকিরণে ফুটিয়া উঠিতেন, তখন মেঘমালা শূন্য

সরিৎ-হৃদয়ে "যেন জ্যোৎস্নার উপর বিদ্যুৎ খেলিত" শত শত হেমনলিনী বিনা প্রভাকরে প্রস্ফুটিত হইত। তাঁহারা রূপের সাগরে রমনীয় দেহলতা ভাসাইয়া পার্শ্ববর্ত্তী দর্পণে আপনার প্রতিবিম্বিত মাধুরী নিরীক্ষণ করিয়া কতবার বিমুগ্ধা হইতেন, তাহা কে বলিবে?

"দেওয়ানী আম" (অর্থাৎ সাধারণের সহ দরবার স্থান) এবং "দেওয়ানী খাস" (কেবল আত্মীয়ের সহিত দরবার করিবার স্থান) ক্রমে দেখিয়া যখন আবার আমরা অন্যদিকের প্রাঙ্গণে আসিলাম, তখন উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণর "কলভিন" সাহেবের যত্ন-প্রোথিত সমাধি আমাদিগের নয়ন-পথে পতিত হইল। সিপাই বিপ্লবে (১৮৫৭ সালে) ইহার মৃত্যু হয়। সমাধি প্রস্তরে জীবন মৃত্যু এবং গুণাবলী স্বর্ণ অক্ষরে খোদিত করিয়া ইংরাজ-রাজ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন।

ঢোলপুর মহারাজাকে পরাজয় করিয়া ইংরাজ কর্ত্তৃক আনীত তাঁহার কামান দ্বয়ও এই স্থানে রক্ষিত হইয়াছে, দেখিলাম। যে জাতি ছুরিকা

গৃহে রাখিতেও এখন স্বাধীন নহেন, তখন এত বড় কামানের মর্য্যাদা তাঁহারা বুঝিতে অবশ্যই অপারক, কি অনভিজ্ঞ ছিলেন না। শুনিলাম ঐরূপ সুন্দর কামান আপাততঃ নাকি পাওয়া যায় না।

দুর্গের মধ্যবর্ত্তী সমুদায় দর্শনীয় মনোহারিতা পরিদর্শন করিয়া সেই সমুদায় দৃশ্য পরিত্যাগ করিবার সময় আমরা সোমনাথ মন্দিরের শ্বেতচন্দন বিনির্ম্মিত বৃহৎ ভগ্নদ্বার দেখিতে গেলাম। এই জীর্ণ স্মৃতি একটী ভগ্নপ্রায় মলিন গৃহে ধূলি ধূসরিত ভাবে রহিয়াছে, কিন্তু তাহার সৌন্দর্য্য এখনও সম্পূর্ণ রূপে তিরোহিত হয় নাই। এই পবিত্র দ্বার সোমনাথের গৌরবের সাক্ষীরূপে জীর্ণতায় ও অদ্যাপি আপনার মহিমা প্রকাশ করিতেছে এবং যবনরাজ কর্ত্তৃক সোমনাথের ধ্বংশ ও অসংখ্য মণি মুক্তাদি অপহরণের ইতিহাস স্মরণ করাইয়া দিতেছে। দিবাবসানের পূর্ব্বেই আমাদিগের অশ্বযান সেকেন্দ্রাভিমুখে প্রধাবিত হইল এবং অনতিবিলম্বে আমরা সেই সমাধিক্ষেত্রে গিয়া নামিলাম। সেকেন্দ্রা আগ্রা নগরীর বাহিরে, তবে

অতি সামান্য দূর মাত্র। এখানে গাড়ী দেখিলেই মুসলমানগণ আপ্যায়িত করিতে দলে দলে আইসে কিন্তু সেই আত্মীয়তার বিনিময়ে অযাচিত অনুগ্রহের প্রতিদানে পয়সা দিতে হয়। সেকেন্দ্রাতে আকবর বাদসাহের ও তাঁহার অন্যান্য পরিজনবর্গের সমাধি রহিয়াছে। সেই সকল সমাধির অবস্থা এখন অতীব শোচনীয়। কাহারো মন্দিরভগ্ন, কাহারও প্রস্তর খণ্ডের স্বর্ণাক্ষর বিলুপ্ত, কাহারও বা সমাধিশয্যা সম্পূর্ণ ভাঙ্গিয়া ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে। চারিদিকে শ্মশানের হাহাকার এবং জনশূন্যতার নিস্তব্ধ রোদন, কি দেখিব, কি শুনিব, বুঝিতে পারিলাম না, কেবল দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত শ্মশানের সেই ভগ্ন চিত্র স্মৃতিতে মিশাইয়া গেল।

বাদসাহদিগের সমাধির একটু দূরে আর একটী সমাধি-সৌধ দেখিলাম, কিন্তু তাহার ভিতরে আমরা যাই নাই। সেই খানের লোকের মুখে শুনিলাম যে, এই "শীশমহল" মহারাজ মানসিংহের ভগ্নীর স্মরণার্থে সংস্থাপিত এবং তাঁহার ভস্মাবশেষ উক্ত

মন্দির-হৃদয়ে যত্নে সমাধিতলে প্রোথিত করা হইয়াছে। এই জনশ্রুতি কতদূর সত্য, তাহা আমি বলিতে পারি না। কোন ইতিহাসে কিম্বা “হিন্দুর ভ্রমণ বৃত্তান্তে” এবিষয়ে কোন উল্লেখ আছে কি না, তাহাও এখন আমার স্মরণ হয় না। আগ্রা সম্বন্ধে দুই একটী নামের উচ্চারণ ও স্থানের বিষয় “ভোলানাথ চন্দ্রের” সহিত আমার মিল নাই। আমার ভুল, কি তাঁহার ভুল সে মীমাংসা পাঠকগণ করিবেন। তবে আমার নিজের বোধ হয় যে, ভোলানাথ চন্দ্রেরই ঠিক। তাঁহার ও আমার অবস্থাগত বিভিন্নতায়, তিনি প্রবাসে যাইয়া যে সকল সুবিধা পাইয়াছেন, আমি গিয়া তাহা পাই নাই এবং তাহাতেই আমার সম্ভবতঃ প্রমাদ ঘটিতে পারে। সে যাহা হউক, “হিন্দুর ভ্রমণ বৃত্তান্তে” সময় সময় আমাকে স্থানাদির বিষয়ে সাহায্য করিয়াছে সে জন্য আমি কৃতজ্ঞ আছি।

আকবর বাদসাহের সমাধির পার্শ্বে তাঁহার ধাত্রী পুত্রের সমাধি রহিয়াছে। ধনী মুসলমানগণ ধাত্রীর

স্তন্যদুগ্ধে নাকি প্রতিপালিত হন। সেই জন্য তাঁহারা ধাত্রীকে মাতৃ সম জ্ঞান করিয়া তাহার পুত্রকে সহোদরের ন্যায় স্নেহ ভক্তি করিয়া থাকেন। সম্রাট আকবর পরম ধার্ম্মিক ছিলেন, সুতরাং তাঁহার সকল কাজই প্রীতিকর এবং উল্লেখ যোগ্য বলিয়া বোধ হয়।

আমরা এই সমাধির অট্টালিকার উপর হইতে ফতেপুরে শিকড়ির দৃশ্য কতক কতক দেখিলাম। কিন্তু চর্ম্ম চক্ষে তত ভাল দেখা গেল না, "দূরবীক্ষণের মর্ম্ম চক্ষে" দেখিলে হয়ত আরও সুন্দরতর দেখাইত। দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা নিহাত বাঙ্গালী, তাহাতে আবার দূরবীক্ষণ অনুবীক্ষণের "তত ধারধারি না সুতরাং যন্ত্রহীন "বিধাতা-নির্ম্মিত চারু মানব-নয়নে" যাহা দেখা সম্ভব, তাহাই দেখিয়া, পরিতৃপ্ত মনে, সায়াহ্ন সমীরণ সেবন করিতে করিতে বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দিবা ক্লান্তি দূর করিলাম।

মথুরা।

২৬এ ফেঃ প্রত্যুষেই আমরা সুন্দর আগ্রাপুরী পরিত্যাগ করিয়া মথুরাভিমুখে যাত্রা করি।

আগ্রার গাড়ী ত্যাগ করিয়া আমরা যখন হাট্রাসে মথুরার ট্রেনে চড়িলাম, তখন ঊষার সুখময়ী মূর্ত্তি, তরুণ তপনের মধুর হাস্য পূর্ব্ব গগন অনুরঞ্জিত করিয়া আমাদিগের হৃদয়ে আশার তরঙ্গ তুলিয়া দিল। সেই শোভা আবার প্রভাতিক বিহঙ্গের কলকণ্ঠ স্বরে আরো দ্বিগুণতর ঘনীভূত হইয়া যেন অভিনব প্রকৃতির অঙ্গে অঙ্গে দীপ্তি পাইতে লাগিল। এমন শান্তিময় সুখপ্রভাত-দর্শন মনুষ্যের ভাগ্যে অতীব দুর্ল্লভ। মথুরা যাইবার পথে বিস্তৃত শ্যামল ক্ষেত্রে মৃগ শিশুগণ কোথায় বা নির্ভয়ে শুইয়া আছে, আবার কোথায় তাহারা চকিতে চাহিয়া, শব্দমাত্র শ্রবণে অদৃশ্য হইয়া যায়। এই আছে এই নাই, কেমন মনোমোহন দৃশ্য! ইহা দেখিয়া অতীত কালের পবিত্র তপোবনের চিত্র মানসক্ষেত্রে সমুদিত

হয়। জীবনের এ সুখস্বপ্ন, বাস্তবিক স্বপ্ন নহে। যিনি এ দৃশ্য, এমন প্রভাত কখন নয়ন ভরিয়া দেখেন নাই, তাঁহাকে আর কি বলিব? আমি জীবনের অনেক প্রকৃত সুখস্বপ্নের স্মৃতির মধ্যে এ স্মৃতিও হৃদয়ে সযত্নে রক্ষা করিব।

হাট্রাসে মথুরা যাইবার জন্য যে গাড়ীতে আরোহণ করিলাম, তাহাকে বাষ্পীয় শকট না বলিয়া গজেন্দ্রগামী বণিকপোত বলিলে ঠিক হয়। এই ট্রেণ কখন চলিবে, কখন থামিবে, তাহার কোন স্থিরতা নাই। গাড়ী যখন চলিতে আরম্ভ করিল, তখন পথিকগণ ইচ্ছানুসারে তাহাতে উঠিতে লাগিল। কাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করে না, করিলেও কথা গ্রাহ্য করিতে কেহ স্বীকৃত হয় না। কোন নিয়মও নাই, যাহার যা ইচ্ছা সে তাই করে। ধূমপানের ধূমের ত সীমা নাই। তামাক খাইবার জন্যও প্রায়ই গাড়ী থামান হইতে লাগিল। আরোহীগণ ইহাকে যেন স্বকীয় বাসভবন মনে করিয়া সেইরূপ ব্যবহার করিয়া নামা উঠা জলযোগ ইত্যাদি করিতে করিতে চলিল।

গরিব আমরা কেবল অধৈর্য্য হইয়া পড়িলাম। ইহার পরিচালকগণ হিন্দুস্থানী। এ গাড়ীর সহিত ইংরাজ কি ফিরিঙ্গীর কিছুমাত্র সংশ্রব নাই, সুতরাং দৌরাত্ম্য কি অপমান কাহাকেও সহ্য করিতে হইল না, তবে সেই মৃদু-মন্দবাহী গজেন্দ্রগমন আমাদের খুব প্রীতি-কর বোধ হয় নাই।

আমাদিগের গাড়ীর পার্শ্বস্থ কক্ষে কতকগুলি ইংরাজীনবিশ হিন্দুস্থানী উঠিয়াছিল। তাহাদিগের হাব, ভাব, কথাবার্ত্তা সমুদায়ই অদ্ভুত। এমন জন্তু বিশেষ মনুষ্য দর্শন আমার কপালে পূর্ব্বে বড় ঘটে নাই। আমি তাহাদিগকে কি বলিয়া ডাকিব, ঠিক করিতে পারি না। মনুষ্য যে এইরূপ ঘৃণার পাত্র হইতে পারে, ইহা দেখিয়া আমার মনে অনুকম্পারও উদয় হইল না। অন্য যাত্রীগণও প্রকাশ্য ভাষায় ঘৃণা প্রকাশ করিয়া কলহের চেষ্টায় ছিল। তাহারা একটু ইংরাজী জানে, বোধ হইল বাঙ্গালাও আধ আধ ভাবে একটু আধটু কহিতে পারে। কিন্তু "Little learning is a dangerous thing" এই প্রসিদ্ধ বাক্য

তাহারা সপ্রমাণ করিয়া আরোহীদিগকে জ্বালাতন করিয়া তুলিয়াছিল। আরোহীগণের সৌভাগ্যবশতঃ গাড়ী খানিক পথ যাইতে না যাইতেই, এক জন বৃদ্ধ পরিব্রাজক পথিমধ্যে এই গাড়ীতে আসিয়া উঠিলেন। তাঁহার পবিত্র সৌম্য মূর্ত্তি ও স্থির দৃষ্টিতে কেমন যেন অপার্থিব ভাব। সে স্নেহময়, গাম্ভীর্য্যপূর্ণ মুখচ্ছবি দর্শন করিয়া প্রত্যেকেই ভক্তিভাবে তাহাকে অযাচিত অভিবাদন করিল। তিনিও হাস্যমুখে সংস্কৃত ভাষায় সকলকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সেই বন্য ব্যক্তিরা প্রথমে একটু পরিহাসের চেষ্টায় ছিল। কিন্তু তাহাদিগের সে চেষ্টা সুবিধামত হইল না। জীবন্ত পবিত্রতা পাপীর হৃদয়েও পুণ্যের শান্তি-বারি ঢালিয়া দেয়। সে হাস্যের হিঃ হিঃ বিকটশব্দ, বাক্যের চাতুরী, এবং পাণ্ডিত্য-প্রকাশক গর্ব্বিত ভাষা কোথায় যেন উড়িয়া গেল, অবিলম্বে সমস্ত নিস্তব্ধ শান্তিপ্রদ ভাব ধারণ করিল।

সচরাচর আমরা পথে ঘাটে যে সকল সন্ন্যাসী দেখিতে পাই, আমি যাঁহার কথা বলিতেছি, তিনি

সে রূপ সন্ন্যাসী নহেন। হিন্দুশাস্ত্রে যাহাকে প্রকৃত সন্ন্যাস বলে, তিনি তাহাই গ্রহণ করিয়া পরমার্থ চিন্তায় নির্ব্বাণ ধর্ম্মে এবং জ্ঞান বিতরণে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। "সদন্নে বা কিদন্নে" তাঁহার সমান প্রীতি, "লোষ্ট্র" ও "কাঞ্চন," তাঁহার নিকট একরূপ। শীত প্রধান দেশে শরীর রক্ষার্থে ও লজ্জা নিবারণ করিতে পরমহংসের পক্ষে যে প্রকার গৈরিক বসন সাজে, তাঁহারও তাই ছিল। একখানি কম্বল এবং তাল পত্রের একটা ছত্র তাঁহার জীবনের প্রয়োজনীয় স্বরূপ সঙ্গে আছে, দেখিলাম। তিনি দ্বারকা হইতে মথুরায় জনৈক সন্ন্যাসীর মঠে শাস্ত্রীয় বিচারের মীমাংসার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া শিষ্যসহ যাইতেছেন, শুনিলাম।

সোঁ, সা, করিতে করিতে কোন প্রকারে চলিয়া থামিয়া, অতি কষ্টে আমাদিগের গাড়ী বেলা ১০ ঘটিকার সময় মথুরা আসিয়া পৌঁছিল, আমরাও সুপ্রসন্ন মনে নামিয়া নিস্তার পাইলাম।

রৌদ্র তখনি চারিদিকে চনচন করিতেছে, আম-

রাও সম্পূর্ণ অপরিচিত এবং পরিশ্রান্ত। অশ্বযান সহরে প্রবেশ করিল, আমরা বাসা খুজিয়া লইবার জন্য এদিক ওদিক একটু করিতে লাগিলাম, বেশিক্ষণ কষ্ট পাইতে হইল না, মুহূর্ত্ত মধ্যে বহুসংখ্যক পাণ্ডা আসিয়া আমাদিগের গাড়ী ঘেরিয়া ধরিল এবং আমাদের পূর্ব্ব পুরুষ পূর্ব্বে কেহ কখন মথুরা গিয়াছিলেন কি না, তাহাই জনে জনে খাতা খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। অতগুলি লোকের খাতার নামাবলী শ্রবণ করিবার ধৈর্য্যবল ও সৌভাগ্য না থাকায়, তাহারা আমাদিগকে ক্রমে মুক্তি দিয়া চলিয়া গেল। কেবল তিনজন মাত্র পাণ্ডা আমাদের গাড়ীর বাহিরে চড়িয়া একটী অতি সুন্দর প্রস্তরের বাড়ীর সম্মুখে আনিয়া সেই বাটীতে বাসা স্থির করিয়া দিল। আমরা যমুনার নিকটে একটী বৃহৎ প্রশস্ত দ্বিতল বাটীর একদিক ভাড়া লইলাম; তার অন্যদিকে মথুরার মুন্সেফ বাবু সপরিবারে ছিলেন। পাণ্ডাঠাকুরেরা আমাদিগের জন্য বিশুদ্ধ দুগ্ধ ঘৃত মিষ্টান্ন প্রভৃতি হিন্দুর আহারীয় সামগ্রী আনিয়া দিয়া, মাছ মাংস আনিতে

নিষেধ করিয়া, তখনকার জন্য বিদায় হইলেন। তাহাদিগের মুখে গল্প শুনিলাম, কলিকাতা হইতে কয়েক জন ব্রাহ্ম নাকি মথুরায় বেড়াইতে গিয়াছিলেন ও আমরা যে বাসায় ছিলাম, তাঁহারাও সেইখানে ছিলেন। কিন্তু গৃহস্বামীর অমতে স্বাধীনতা প্রকা-শার্থে গোপনে অনেক মাছ মাংস ও পলাণ্ডু খাইয়া-ছিলেন। সেই সকল গৃহকোণে লুকাইয়া রাখাতে ধরা পড়িয়া শেষে অপমানিত হইয়া বাসা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তাঁহাদিগের সম্বন্ধে আরো অনেক শোচনীয় দুঃখের কথা আমাদিগের কাণে আসিল। কিন্তু তাহা বিশ্বাস না করিলেও তাঁহাদিগের ব্যব-হারের জন্য আমাদিগের একটু কষ্ট পাইতে হয়। আমরা যেন, রুষভীত-ইংরাজ-রাজ্যে ছদ্মবেশী গুপ্ত-চরবৎ সন্দেহের ছায়ায় "নজরবন্দী" পাহারায় রহি-লাম।

মথুরার পাণ্ডাগণের আত্ম-পরিচয়ের রহস্য সহসা ভেদ করা কঠিন। তাহারা যাত্রীগণের নিকট আসিয়া বলে "আমরা সাড়ে চারি ভাই" কেহ বা

"আড়াই" "দেড় ভাই"। ইহা না বুঝাইয়া দিলে বুঝিতে পারা যায় না। অন্ততঃ, আমরাত "সাধু শুধু সাড়ে পাঁচ ভাই" বুঝিতে পারি নাই। কাজেই ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে হয়। অবিবাহিত ব্যক্তি পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না, সুতরাং যে ভাইরা বিবাহিত তাহারা পূর্ণ ও তাহাদিগের মধ্যে যাহার বিবাহ হয় নাই, সে অর্দ্ধেক। আমাদিগের ভাগ্যে "সাড়ে পাঁচ ভাই" জুটিয়াছিল। এই অর্দ্ধাঙ্গটী বড় সুশীল, মিষ্টভাষী ও প্রিয়দর্শন। তাহাকে ধনীর গৃহের যত্ন-পালিত বালক বলিয়া বোধ হয়। সংসারের কোন চিন্তা নাই, লেখা পড়ারও ধার ধারে না, "লাড্ডু পুরী" মিষ্টান্ন পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করিয়া স্বচ্ছন্দে বেড়াইয়া বেড়ায়। তবে বাঙ্গালী বালকের সহিত ইহার শারীরিক বিভিন্নতা অনেক, তাহাদের মত, ইহারা রুগ্ন দুর্ব্বল ও ম্যালেরীয়া প্রপীড়িত নহে। ইহারা প্রত্যহ নিয়মমত দুইবেলা ব্যায়াম শিক্ষা করিয়া থাকে। কুস্তীর "আড্ডা" আছে, সেখানে অধিক কাল অতিবাহিত করে এবং

কুস্তীতে সুশিক্ষিত হইলে কখন কখন গোয়ালিয়ার হোলকার প্রভৃতি মহারাজ সদনে আত্মবলের পরিচয় দিয়া সম্মানের সহিত পুরস্কার লইয়া আইসে।

মথুরা দেখিতে বড় পরিপাটী। পথ ঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন-ও কোন স্থানে ময়লা নাই। কংসরাজ-রাজধানী মথুরা, ঠিক রাজধানীরই মত সুন্দর। মথুরায় কেমন একটী শান্তিময় শোভা ও নির্জ্জনতা দেখিলাম, ইহা আমার মনের সঙ্গে ঐক্যতানে নীরবে মিলিয়া গিয়াছিল। আমি মথুরা গিয়া কেমন যেন এক স্মৃতি-স্বপ্নে ডুবিয়া গিয়াছিলাম, কেবল মুক্ত গবাক্ষে দাঁড়াইয়া চারিদিকের শোভা প্রাণ ভরিয়া দেখিতাম, এবং যমুনার কল কল নাদে আমার স্মৃতিমগ্ন হৃদয় ঘুমাইয়া যাইত। কল্পনায় স্মৃতিতে ও আশার চিন্তাতে দিন কাটাইতাম, প্রবাসের শূন্যতা তত অনুভব করি নাই। মথুরাবাসী স্ত্রী পুরুষগণ প্রায়ই গৌরাঙ্গ ও সুস্থ। তাহাদিগের শিশু-সন্তানগুলি এমন সুশ্রী এবং সবল যে দেখিলেই সাদরে কোলে তুলিয়া লইতে ইচ্ছা করে। পাণ্ডাদিগের সুন্দর সুন্দর বালকগণ পরিষ্কার

পরিচ্ছদে দেবালয়ের পথে পথে দাঁড়াইয়া, আধ আধ ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাঙ্গালা ভাষায় "দাদা দিদি" বলিয়া ডাকিয়া যখন সামান্য পয়সা ভিক্ষা চাহে, তাহাতে কেমন মায়া হয় ও কিছু না দিয়া থাকা যায় না। একটী স্বর্ণ মুদ্রায় লোকের যত আহ্লাদ না হয়, একটা পয়সা মাত্র পাইলে ইহারা ততোধিক আনন্দিত হইয়া থাকে। "ব্রজবুলি" মধুর কণ্ঠে গাইয়া এবং যাত্রী-গণের সম্মুখে করতালি দিয়া যে নৃত্য করে, তাহা দেখিতেও আমোদ আছে।

ধনবান ব্যক্তি পুত্রহীন হইলে সকল দেশেই পোষ্যপুত্র রাখিবার নিয়ম আছে, কিন্তু বাঙ্গালী যেরূপ দুর্ব্বল ও ক্ষীণ জীবী, তাহাদিগের সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য সংস্কার করা আবশ্যক। এই সকল ব্রাহ্মণ বালক-গণকে নিঃসন্তান ধনী বাঙ্গালীরা পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়া সুশিক্ষিত করিলে, ও প্রাপ্তবয়সে বাঙ্গালী বালিকাদিগের সঙ্গে বিবাহ দিলে সময়ে বেশ বলবান ও স্বাস্থ্যপূর্ণ সন্তান জন্মিতে পারে, এবং তাহাতে খুব উপকার হইবার সম্ভাবনা। সমাজ-সংস্কারকগণ এই

বিষয়ে চেষ্টা করিলেও সমাজের পক্ষে একটী স্থায়ী উপকার করিতে পারেন। বাল্যবিবাহ উঠাইলে, ও বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিলে যেমন সামাজিক মঙ্গল, তেমনি বঙ্গবাসীর স্বাস্থ্য সংস্কার এইরূপে করিতে পারিলেও উপকার আছে। আমাদিগের সমাজে অদ্যাপি রাঢ়ী বারেন্দ্রের মধ্যে পর্য্যন্ত বিবাহ প্রথা প্রচলিত না থাকাতে কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তিদিগের যে কত কষ্ট সহিতে হয়, তাহা কাহারো অবিদিত নাই। তাহাতে আবার "পাশকরা" ছেলের উৎপাতে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। আমাদিগের দেশহিতৈষীগণ এই সকল প্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রতি কেন মনোযোগ দেন না, তাহা দুঃখের সহিত বুঝিতে পারি না। কেবল মাত্র রাজনৈতিক আন্দোলনে সামাজিক অশেষ দুর্গতি যাইবে না। আর সমাজ-সংস্কারক মহাশয়েরাও অসবর্ণ বিবাহ-প্রথা প্রচলিত করিবার জন্য এত চিন্তা ও যত্ন না করিয়া অগ্রে সবর্ণে সবর্ণে ঐপ্রকার বিবাহ দিবার চেষ্টা ও আন্দোলন করিলে সামাজিক কল্যাণ সাধন করা হয়।

মথুরায় অনেক বাঙ্গালী কার্য্যোপলক্ষে বাস করেনও তাঁহাদের সহবাসে পাণ্ডাগণ বেশ "চলন সই" এক রকম বাঙ্গালা কথা কহিতে শিখিয়াছে। তাহাদিগের সে আধভাঙ্গা বাঙ্গালা আমার নিকট ভাল লাগিত। আহারাদি করিয়া আমরা সেই দিন বৈকালেই মথুরার বিগ্রহগণ দর্শন করিতে বাহির হইলাম। মথুরায় বেশ গাড়ী পাওয়া যায়, তবে তাহার ভাড়া কিছু অধিক। বাসা ছাড়িয়া প্রথমে আমরা "কংসখেড়া" ও "রণভূম্" দেখিতে গেলাম। এক পাণ্ডা আমাদিগের সহিত থাকিয়া "গাইডের" কাজ করিতে লাগিল। প্রবাদ এই যে, শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন হইতে যখন মথুরাতে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য নানা প্রকার ষড়যন্ত্র করা হয়, কিন্তু বিষ্ণু অবতার কৃষ্ণ, সকল বিপদ অতিক্রম করিয়া সম্মুখ-যুদ্ধে কংসরাজকে বিনাশ করিলেন এবং পরিশেষে স্বয়ং মথুরার রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সেই সমরাঙ্গণের নাম "রণভূম্"। অতি ছোট একটু জমী, চারিদিকে ছোট ছোট গাছ, চারিজন

লোক একত্র হইলে তাহা পূর্ণ হইয়া যায়। কোন কালে যে, সেখানে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহা কেহ না বলিয়া দিলে কল্পনাতেও অনুমান করা যাইতে পারে না। "গলিভার ভ্রমণে" "লীলিপুটীয়ানদিগের" যেরূপ অদ্ভুত যুদ্ধ কাহিনী আছে, এও বোধ হয় সেইরূপ যুদ্ধ এবং রণভূমি। আবার এই যুদ্ধক্ষেত্রে এক ভগ্ন-মন্দিরে চোক মুখ বিশিষ্ট এক মহাদেব মূর্ত্তি আছেন। অত্যাচারী কংসরাজা সমরে নিধন প্রাপ্ত হইলেন দেখিয়া রণক্ষেত্রের মধ্য হইতেই সহসা নাকি শিব আহ্লাদে নৃত্য করিতে করিতে উঠিয়াছিলেন ও তাহাতেই তাঁহার নাম—"রঙ্গেশ্বর মহাদেও" শুনিলাম।

কংসরাজ রাজধানীর ধ্বংশাবশেষ ও গড়খাই দেখিলে, অদ্যাপি রাজকীয় সম্পদের চিহ্ন রহিয়াছে, দর্শকের মনে হয়। এই ভগ্নরাশির মধ্যে একটী ক্ষুদ্র মন্দির সজীবভাবে দণ্ডায়মান আছে; তাহা অতীতের হিন্দু মহিলার পবিত্রতার নিদর্শন। প্রবাদ এই যে, এই "সতীমঠে" কংসের মহিষী বাস করিতেন এবং তিনি এই মন্দিরেই পতির মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিবা-

মাত্র তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করেন ও স্বামীর চিতায় একত্র ভস্মীভুত হন। সেই জন্য তাহার সতীত্বের পবিত্র চিহ্নস্বরূপ এই মঠ, "সতীমঠ" নামে উৎসর্গ করা হইয়াছে ও ধনকুবের জগৎ শেঠরা তাহা পুনর্ব্বার সংস্কার করাইয়া যান। তাহাতেই আজিও "সতী-মঠ" নূতন অবস্থায় রহিয়াছে যেন বোধ হয়। এই গল্প আমরা পাণ্ডাঠাকুরদিগের মুখে শুনিয়াছি, ও তাহা সত্য কিনা, সে বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার কোন চেষ্টা করার প্রয়োজন বোধ হয় নাই। ভাল গল্প, ভাল লাগিল সুতরাং লিখিলাম। ভারতীয় রত্নভাণ্ডারে কত কীর্ত্তিময়ী মহিলার ঐরূপ পবিত্র জীবন-কাহিনী লুক্কায়িত আছে, তাহার খোঁজ কে করিবে? ইতি-হাসহীন ভারতের পূর্ব্ব গৌরব এখন হয়ত বিদেশীর নিকট মূল্য শূন্য উপকথা, কিন্তু আমাদের কাছেত তাহা নহে।

প্রভাত সায়াহ্নে "মথুরাবাসিনী মধুর হাসিনী শ্যামবিলাসিনী"বা নানা বর্ণের বিচিত্র বসন পরিয়া পুষ্পমালা হস্তে দেবদর্শনে যায়। তাহাদিগের অব-

গুণ্ঠণাবৃত সৌন্দর্য্যরাশি মুগ্ধ ভাবে দর্শন করা যদিও প্রবাসীর ভাগ্যে সকল সময় ঘটিয়া উঠে না, তবুও যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে তাহারা যে সুন্দরী, সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ জন্মে নাই। সাধারণতঃ তাহারা গৌরাঙ্গিনী এবং তাহাদিগের মুখশ্রী বেশ জ্যোতির্ম্ময়। তবে পশ্চিমাঞ্চলের মহিলাগণ প্রায়ই সুকেশিনী নহে। বঙ্গনারীর সুদীর্ঘ কুঞ্চিত কেশ কলাপ তাহাদিগের নিকট উপাদেয় এবং হিংসনীয় সামগ্রী। পাণ্ডাগণের প্রমুখাৎ শুনিলাম যে "মথুরাবাসিনীরা" নাকি গৃহকার্য্য করে না, এবং বঙ্গরমণীর ন্যায় "ধারাপাতে মূর্ত্তিমান, চারুপাঠ পড়া" শিখিয়া অসার আমোদে ও তাসক্রীড়ায় এবং আলস্যে জীবন কাটায়। বঙ্গের নব্যাগণ কোনরূপ ধর্ম্মকর্ম্মও করে না, কিন্তু ইহারা দুই বেলা "মথুরানাথ" দর্শন না করিয়া জলগ্রহণ করে না, এই প্রভেদ।

আমরা সন্ধ্যার পূর্ব্বেই মথুরার চারিদিকে দেখিয়া আরতির একটু আগে "মথুরানাথ" দর্শনার্থে তাঁহার মন্দিরে গেলাম। কিন্তু তখনি সেই প্রকাণ্ড দেবা-

লয় জন কোলাহলে এবং মনুষ্য মস্তকে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে, একটু দাঁড়াইবার স্থান পর্য্যন্ত নাই। লোক ঠেলিয়া সেই গোলে মিশিয়া বিগ্রহ দর্শন করা তৎকালে ঘটিল না। কোনরূপে পাণ্ডা ঠাকুর-দিগের সাহায্যে সংকীর্ত্তন প্রাঙ্গণে আমরা নিরাপদে একটু আশ্রয় পাইলাম।

দেখিতে দেখিতে দীপালোকে সমুদায় দিবাবৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। গায়কগণ মধুর হরিনাম সং-কীর্ত্তন আরম্ভ করিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে সেই অবি-শ্রান্ত কোলাহল থামিয়া সকল নিস্তব্ধ হইয়া গেল। সেই অসংখ্য প্রাণী বৃন্দ একেবারে নীরবে ভক্তিভাবে হরিপ্রেমে নিমগ্ন হইয়া স্তব করিতে লাগিল। আর কোন শব্দ নাই, প্রতিধ্বনিও সেই সান্ধ্যসঙ্গীতে মিশিয়া কোথায় গেল, তাহা কে বলিবে। সহসা এই নিস্তব্ধতা ভেদ করিতে বায়ু পর্য্যন্ত সাহসী নহে, সেও আর সে দিকে বহিতে না পারিয়া, হরিগুণে মজিয়া মথুরার দ্বারে দ্বারে পবিত্র গান গাইয়া যেন বেড়াইতে লাগিল। এই অপরূপ দৃশ্যে, এই প্রাণ-

পূর্ণ ভক্তিভাবে ও অলৌকিক সংকীর্ত্তন শ্রবণে আমরা স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। এমন ভক্তিভাব, এমন মোহ-ময় আত্মবিস্মৃতি!—প্রতিদিন মথুরানাথের মন্দিরে আসিয়া যাঁহারা ইহা দেখিয়া যান, তাঁহাদের নিকট ইহা কল্পনায় অনুভব করিবার সামগ্রী নহে। এইরূপ পবিত্র মনোহর কীর্ত্তন আমিত কখনও শুনি নাই। বৈষ্ণবদিগের তখনকার সেই আনন্দময় ভক্তিপূর্ণ উৎ-সাহ দেখিলে মনে শান্তির উদয় হয়। জগতে চৈত-ন্যের পবিত্র ধর্ম্ম, পতিতের আশ্রয় ও পাপীর মুক্তি। সময় ও অবস্থার পীড়নে তাহার সে পবিত্রতা নাই। তথাপি এই আরতির সংকীর্ত্তন শ্রবণ করিলে ক্ষণ-কালের জন্যও পতিত জনের হৃদয়ে পরকালের কথা উদিত হয় এবং হরিনামের মোহে ইহ সংসার ভাসিয়া যায়। এমন ঈশ্বর গুণ গান শুনিলে, আমার বোধ হয়, অধম মনুয্যজীবন তরিয়া যায়। মৃত্যুর পূর্ব্বে সজ্ঞানে জাহ্নবী সৈকতে শুইয়া যিনি ভক্তিভাবে এইরূপ হরি-সংকীর্ত্তন শুনিয়া মরিতে পারেন, তাঁর আর পুনর্জ্জন্ম নাই বোধ হয়।

আমরা এখান হইতে আবার "বিশ্রাম ঘাটের" আরতি দেখিতে গিয়া আর এক ঐন্দ্রজালিক দৃশ্যে ডুবিয়া গেলাম। এই "বিশ্রামঘাটে" শ্রীকৃষ্ণ স্নান করিয়া "বংশী" ও "মোহনচূড়া" রাখিয়া যান এবং সেই জন্য ইহাকে "বিশ্রামঘাট" বলে। এইখানে শত সহস্র ব্যক্তি যুক্ত করে মুদ্রিত নয়নে দাঁড়াইয়া "জয় জয়" শব্দে নিশীথ নীলাম্বর প্রতিধ্বনিত করিতেছে। রাশি রাশি সুরভিময় কুসুমহার চারিদিক হইতে জলধারার ন্যায় বর্ষিত হইতেছে, শাঁক ঘণ্টা এবং কাঁশর রবে যমুনার হৃদয়েও যেন কম্পিত তরঙ্গ উঠিয়াছে। আর কিছু দেখা যায় না, কেবল লোকারণ্য, তাহার মধ্যে শান্তিরক্ষকের গম্ভীর মুখ। প্রতি সন্ধ্যায় তাহারা নিয়মমত "বিশ্রামঘাটে" আসিয়া থাকে, নতুবা গোল থামাইয়া যাত্রীগণের ও দর্শকের জীবন রক্ষা করা সুকঠিন ব্যাপার।

"বিশ্রামঘাটের" আরতিতে একটু নূতনত্ব আছে। একজন অতি বলবান্ ব্রাহ্মণ উজ্জ্বালিত সহস্র দীপাধার প্রথমে হস্তে লইয়া তারপর বক্ষে তুলিয়া, এবং

পরিশেষে মস্তকে করিয়া আরতি করেন। তাহার কৌশলময় আরতি সকলেই মুগ্ধবৎ নেত্রে দেখিয়া ধন্য ধন্য করে। সেই ব্যক্তি এতই লম্বা যে, তাঁর মস্তক এত লোকের মাঝেও প্রত্যক্ষ রূপে দেখা যায়।

"বিশ্রামঘাটে" আরতির সময় পুষ্প বিক্রেতা রমণীরা ফুলমালা ও দীপ লইয়া সারি সারি বসিয়া থাকে। তাহারা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তবে তাহাদিগের মধ্যে রূপে কেহ বঙ্কিম বাবুর "রজনী" কিম্বা লর্ডলিটনের "নিডিয়া"র মত না থাকিলেও তাহারা যে প্রায় সকলেই দেখিতে ভাল তাহা আমি বলিব। কেমন পবিত্রতামাখা কোমল মুখে তাম্বুল-রাগ-রঞ্জিত, শোভাময় দীপালোকে বসিয়া সলজ্জভাবে যাত্রীগণকে ডাকিয়া ফুল মালা লইতে বলে। সে স্বরে মায়া আছে, ব্যবসার চাতুরী নাই। সে কণ্ঠ কোমলতায় পরিপূর্ণ, বিক্রেতার কপটতা তাহারা যেন জানে না। ফুলমালা স্ত্রীপুরুষে সকলেই ক্রয় করে, কিন্তু প্রদীপ কেবল স্ত্রীলোকেরাই কিনিয়া প্রিয়জনের মঙ্গল কামনায় যমুনাবক্ষে ভাসাইয়া দেয়। যাহার

শুভ উদ্দেশ্যে তাহা ভাসান হয়, দীপ ডুবিয়া গেলে তাহার সমূহ অমঙ্গল। আর তাহা ভাসিতে ভাসিতে দূরে গিয়া অদৃশ্য হইলে কোন অশুভ নাই। আমি কোন দীপ নিমগ্ন হইতে দেখি নাই। নীল যমুনার বক্ষে সেই অসংখ্য দীপমালা যখন ভাসিয়া যায় এবং মৃদুল বায়ুভরে একটু নিবু নিবু হইয়া আবার তখনি জ্বলিয়া উঠে, সে শোভা অপূর্ব্ব ও অপার্থিব। তাহা একবার মাত্র দেখিলে মনুষ্য ইহ জীবনে কখন আর ভুলিতে পারিবে না। আমি যখন অতি-বালিকা সেই সময় কোন এক সংবাদ পত্রে একজন ইংরাজ ভ্রমণকারীর একখানি পত্র (বাঙ্গালা অনুবাদ) পড়িয়াছিলাম, তাহাতে যমুনার ঘাটের এই দীপ ভাসাইবার বর্ণনা ছিল এবং তাহা এমন সুন্দর ভাবে লিখিত হইয়াছিল যে, আজ কত বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, তবু আমার সেই শৈশবের স্মৃতি অদ্যাপি সজীবিত রহিয়াছে। আমি নিজে তাহা স্বচক্ষে না দেখিলেও লিখিবার সময় কল্পনার সাহায্যে সে দৃশ্য এইরূপই অনুভব করিতে পারিতাম, বোধ হয়।

এদিকে আরতির শোভা, আবার অন্য দিকে যমুনার বক্ষে অযুতদীপালোকের উজ্জ্বলতা ও তটভূমে মনুষ্য হস্তে আহার লইবার জন্য কচ্ছপ কুলের প্রতীক্ষা এই সকলের মিলিত শোভা; এই সব দৃশ্য একত্র অবলোকন করিয়া আমার হৃদয় আনন্দ-উচ্ছ্বাসে এবং আশা-নৈরাশ্যে কেমন যে হইয়া গেল, তাহা বলিতে পারি না। যমুনাতীর ছাড়িয়া রাত্রে বাসায় আসিলাম, কিন্তু তখন সকলই আবার আঁধারে মিশিল, এখন আর কিছু স্মরণ নাই। মনুষ্যের প্রাণের উপর দিয়া যুগ যুগান্তর বহিয়া যায়, তথাপি স্মৃতি জাগরিত রহিয়া অতীতের সমুদায় স্বপ্নবৎ স্মরণ করাইয়া কখন কখন যেন শান্ত্বনা করে। জীবনের অন্য অনেক প্রিয় স্মৃতির মধ্যে এই ভ্রমণের স্মৃতিও আর একটী প্রিয়তর সামগ্রী।

(বৃন্দাবন-পথে।)

দ্বিতীয় নিশা প্রভাতে মথুরাপুরী পরিহার মানসে আমরা সমস্ত দিন বাসায় বিশ্রাম করিয়া অপরাহ্নে

বৃন্দাবন দর্শনার্থে অশ্বযানে বাহির হইলাম। বৃন্দাবনের এই পথের চারিধার ঘন কৃষ্ণ ছায়াময় সুদীর্ঘ বৃক্ষাবলী পরিশোভিত কাননরাজি নব দুর্ব্বাদলে এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়া রহিয়াছে। মধুর নিস্তব্ধতা, এই পথ দিয়া ধীরে ধীরে আমাদিগকে যেন আর এক অভিনব প্রকৃতিরাজ্যে লইয়া চলিল। প্রকৃতি সুন্দরী প্রাণ খুলিয়া পবিত্র নবীভুত সৌন্দর্য্যরাশি অকাতরে পথিকের জন্য এদিক সেদিক ছড়াইয়া রাখিয়াছে, তাহার এ জগতে রোগ শোক জ্বালা যন্ত্রণা নাই। সকলি শোভা, সকলি মাধুরী। ভাবুকজন এখানে আসিলে নয়ন ভরিয়া কল্পনার শোভা বাস্তবিক রাজ্যে দেখিতে পান। আর শোকাভিভূত মনুষ্য-হৃদয় ইহাতে জুড়াইয়া যায়। আর্য্যগণই যথার্থ কবি, তাঁহারা জীবন্ত কবিতা অধ্যয়ন করিতে এই সকল পুণ্য তীর্থ পরিদর্শন প্রথা প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন।

"অহিংসা পরমধর্ম্ম" এই মহদ্বাক্যের সার্থকতা এই সব স্থানেই হইয়াছে। মনুষ্যের সহিত ময়ূর ময়ূরী এবং মৃগশিশুগণ একত্র পথে পথে ভ্রমণ করিয়া

বেড়ায়। তাহা দেখিলে পুণ্যময় অতীতকালের তপোবন স্মৃতি আমাদিগের মানস পটে আবার জাগরুক হয়! ঋষিকুমার কুমারী যে হরিণ-শিশুর সহিত ক্রীড়া করিতেন, তাহা আর্য্য কবির কল্পনা নহে, প্রকৃত চিত্র।

আমরা সন্ধ্যাসমাগমে চিরবসন্তময় রাজ্য বৃন্দাবনে আসিয়া নামিলাম। এক জন বৃদ্ধ বৈষ্ণব আমাদিগকে তাহার বাটীতে বাসা দিয়া অন্যত্র উঠিয়া গেল। বৃন্দাবনের বাড়ী "কুঞ্জ" নামে অভিহিত। যাত্রী দেখিলে বৈষ্ণবগণ আপন আপন "কুঞ্জে" বাসা দিতে যত্ন করে, তবে আমাদিগকে প্রকৃত তীর্থ যাত্রী বোধ না হওয়াতে তাহারা বড় সাধিয়া বাসা দিতে অগ্রসর হইল না। এখানেও পাণ্ডাঠাকুর মূর্ত্তিমান্, তাঁহারাই সকল সুবিধা করিয়া দিলেন।

বৃন্দাবন।

মথুরা হইতে বৃন্দাবন কয়েক ক্রোশ পথ মাত্র ব্যবধান এবং চতুর্দ্দিকে নীল শোভাময়ী যমুনা, মধ্যে স্বর্ণ কমলবৎ বৃন্দাবন দ্বীপসম বিরাজিত, ইহাকে "আলোদ্বীপ আঁধার সাগরে" বলা যায়। এ পুণ্য-দ্বীপের মাধুরী জীবলোক মুগ্ধ-কর ও পত্র পুষ্প বিশিষ্ট। নব পল্লবিত শ্যামল তরুকুলের চির প্রফুল্ল সৌন্দর্য্য রাশি এ দ্বীপ অঙ্গে নিরীক্ষণ করিলে ইন্দ্রালয়ের নন্দন কানন কল্পনা-নেত্রে যেন ফুটিয়া উঠে।

শান্তিময়ী যমুনার ঘাটশ্রেণী পৃথক্ পৃথক্ নাম ধারণ করিয়াছে। এই সকল ঘাটে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে শ্রীকৃষ্ণ বিহার করিতেন, সেই নিমিত্ত ইহার স্মৃতি ভক্ত বৈষ্ণব বৃন্দের নিকট অতীব আদরণীয়। তাঁহারা যে ভাবে এ সকল ঘাট দর্শন করেন, আমরা সে ভাবে তাহা না দেখিয়াও প্রচুর আনন্দ পাইয়াছি।

মাননীয় বঙ্কিম বাবুর শ্রীকৃষ্ণ নহেন, গোস্বামী মহাশয়ের কিম্বা বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের কৃষ্ণঠাকুর ে

ঘাটের কদম্ব তরুশাখায় গোপবালার অপহৃত বস্ত্র রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই বৃক্ষের পল্লব একটু নূতনতর। গোপীনাথের "করপুটের চিহ্ন" নাকি ঐ সমুদায় পত্রাবলীতে প্রকাশিত হইতেছে। ভক্তজনের চক্ষে দেবতার লীলা খেলা অবশ্যই মালিন্যকণাহীন কিন্তু দুঃখের বিষয় বৈষ্ণব কবিগণ ভক্তির স্রোতে, কবিত্ব-হিল্লোলে ভাসিয়া গিয়া তাহাদিগের "মহাপ্রভুকে" কিছু বেশি মাত্রায় বিলাসী করিয়া ফেলিয়াছেন। মহাজন পদাবলী ও অন্য বৈষ্ণব গ্রন্থ পড়িলে ভক্তি বিষাদে পরিণত হয়। তবে আজি কালিকার অনেক বিজ্ঞ সমালোচক কৃষ্ণচরিত্রে নানা প্রকার অলৌকিকতা দেখাইতেছেন।

আরতির মধুর হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন বাসায় রহিয়া শুনিতে শুনিতে সুনিদ্রায় বিভাবরী পোহাইলে "রূপসী ঊষার অরুণ ভূষার তরুণ" শোভা নিরীক্ষণ করিয়া আমরাও "পথিক মন"কে জাগ্রত করাইয়া পরদিন প্রভাতেই দেব দর্শনে গমন করিলাম।

বৃন্দাবনে গাড়ী প্রভৃতি পাওয়া যায় না, সুতরাং

পদব্রজে গমন করাই নিয়ম। জুতা, ছাতা ও ছড়ি লইয়া মন্দিরে প্রবেশ নিষেধ থাকায়, তাহা দ্বার-বানের নিকট গেটে রাখিয়া যাইতে হয়। "এখানে আসিলে সকলি সমান," লক্ষপতি হইতে অতি গরিব পর্য্যন্ত এ স্থানে "একই মূল্য বহন করে, এ বাজারে সব এক দর" "রাজা, মহারাজা, "মহামহোপাধ্যায়" "নক্ষত্র" অনক্ষত্র "রায়-বাহাদুর" হইতে সামান্য কৃষক এখানে আসিয়া পাদুকা-বিহীন হন। ইংরাজের কিম্বা বিধাতার উপাধির এ স্থানে সমান গৌরব।

প্রথমেই আমরা "গোবিন্দজী ও রাধারাণী" দেখিতে গেলাম। তখন কেবল মাত্র ললিত প্রভাত-রশ্মি উচ্চ মন্দির চূড়ায় কনক কিরণে প্রতিভাত হই-য়াছে ও কল-পিক-কূজনে বৃন্দাবন জাগিয়া উঠিয়াছে, সেই সময়ই মন্দিরের চারিধার লোকারণ্যে পরিপূর্ণ এবং যাত্রীগণ যুক্তকরে বসিয়া যেখানে হরিনাম জপ করিতেছিল, আমরাও সেখানে গিয়া দাঁড়াইলাম। গোবিন্দজী ও রাধারাণীই বৃন্দাবনের প্রধান বিগ্রহ।

গৃহত্যাগী ভিখারীর স্থান বৃন্দাবন, বৈষ্ণব কিম্বা

গোস্বামী ভিন্ন অন্য লোক তত দেখিতে পাওয়া যায় না। অধিকাংশ পুরুষ কৌপীন ও নামাবলীধারী, আর স্ত্রীলোকেরাও এখানে অতিসঙ্কীর্ণ বস্ত্র পরিধান করে। পূর্ব্ব বঙ্গের বৈষ্ণব বৈষ্ণবী এখানকার অধিবাসীর মধ্যে বেশি হইলেও নবদ্বীপ শান্তিপুরের গোস্বামী মহাশয়দের খুব দর্শন পাওয়া যায়।

বাজারে মৎস্য মাংসের সম্পর্কও নাই, খাদ্য ভিখারীর উপযোগী, কিন্তু দুগ্ধ ঘৃত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। গোচারণও নবনীত অপহরণ ক্ষেত্রে দুগ্ধ ঘৃত পাওয়া যাইবারও কথা। এখনত ভারত বৃন্দাবন গোপিনীর দেশ নয়। প্রতি বৎসর অনেক নূতন নূতন "আইন কানুন" প্রচার করিয়া "কানাই বলাই" একত্রে "কাউন্সিলের" শোভা বর্দ্ধন করিতেছেন।

এখানকার মনোহারীর দোকানে কেবল তুলসির মালা, তিলক "রজ" (বৃন্দাবনের ধূলা) ও নামাবলীই পাওয়া যায় এবং তাহাই লোকে ভক্তি ভরে ক্রয় করে। বৃন্দাবন-নাথের রাজ্যে সৌখীন বিলাসের উপকরণ কিছু দেখিতে পাইলাম না।

এই সকল পবিত্র তীর্থ স্থানে অসংখ্য পতিত পাতকী আসিয়া বাস করিতেছে। তীর্থের পবিত্রতা তাহাদিগের সহবাসে যেন কমিয়া যায়। অধঃ-পতিত জাতিকে পরিত্রাণ করিতে মহাত্মা চৈতন্যদেব বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করেন। কিন্তু সময়ে তাহাতে অশেষ অমঙ্গল আনিয়াছে। পুণ্যস্থানে মুক্তি লাভের ছলনায় কত প্রকার ঘৃণিত কার্য্যে যে তাহারা জীবন কলঙ্কিত ও কলুষিত করিতেছে, তাহা ভাবিলে হৃদয় ব্যথিত হইয়া যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর এই সকল তীর্থস্থানে আবার সহসা বুদ্ধ বা চৈতন্যের আবির্ভাব না হইলে, আর এ পাপ-স্রোত নিবারিত হইবার আশা নাই। সাধু জন সংস্কার-বহ্নি জ্বালাইয়া যদি ইহার অণুপরমাণু একেবারে ভস্মীভূত করিয়া আবার নূতন উপকরণে ইহা প্রস্তুত করেন, তবেই নিস্তার, নতুবা আর এ জীবের মুক্তি সম্ভবে না। ঈশ্বর জানেন এই সকল জীবনের পরিণাম কি ?

ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্রমে লালাবাবুর ব্রহ্মচারী (একজন ধনবান উচ্চবংশজাত ব্রাহ্মণ, উপাধি ব্রহ্মচারী) এবং

টিকারীর মহারাণীর সুন্দর দেবমন্দির দর্শন করিয়া আমরা শেষে শেঠের মন্দিরে গেলাম। লালাবাবুর অক্ষয় কীর্ত্তি বৃন্দাবনের চারিদিকে শোভা করিয়া আছে। তাঁহার "সদাব্রতে" প্রত্যহ দুই বেলা অসংখ্য দীন দরিদ্র অন্ন পানে প্রতিপালিত হইতেছে। সামান্য এক মুষ্টি ভিক্ষা দিয়া কর্কশবাক্যে কেহ তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিতে পারে না। এখানে অনেক ভদ্রলোক ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারী উচ্চ বেতনে নিযুক্ত আছেন, এবং তাহারা সুনিয়মে "সদাব্রতের" কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। বিবাহ কিম্বা উপনয়নের সময় ধনীর গৃহে যেরূপ ভোজের আয়োজন হয়, তেমনি প্রতিদিন পুণ্যাত্মা লালাবাবুর সদাব্রতে আহার প্রস্তুত হইয়া থাকে। যে যাহা খাইতে অভিলাষ করে, তাহাকে তাই পরিতোষ পূর্ব্বক দেওয়া নিয়ম। তাঁহার ঠাকুর বাড়ীর সমুদয় স্থান বড় পরিস্কার পরিচ্ছিন্ন। সদাব্রত অসংখ্য ভিখারীর বাসেও কিছুমাত্র মলিন নহে।

যে লালাবাবুর এই অতুল বৈভবময় পুণ্যকীর্ত্তি বৃন্দাবন জীবিত রাখিয়াছে,—লোকমুখে শুনিলাম,

সেই পুণ্যাত্মা প্রত্যহ বৃন্দাবনের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্ম্ম-রক্ষার্থ রুটি ভিক্ষা করিয়া দিনপাত করিতেন নাকি। এখানকার প্রায় সমুদায় দেবমন্দিরই দেখিতে অতীব মনোরম্য। আর ধনীগণ তাঁহাদিগের ধনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে যেন যত্নসঞ্চিত স্বুবর্ণ দ্বারা আপনা-দিগের দেবমন্দির-চূড়া নির্ম্মাণ করাইয়া ধার্ম্মিক জীব-নের সুখানুভব করিয়াছেন। স্বর্ণ যেমন পবিত্র ও সুনির্ম্মল; তাহার স্থান দেবতার গৃহ চূড়াই যোগ্য। নরদেহ তাহার উপযুক্ত স্থান নহে। ফুল সম্বন্ধে ধার্ম্মিক কবি বলিয়াছেন,

"এমন পবিত্র, এমন নির্ম্মল
দেবপদ ভিন্ন কোথা শোভে বল ?"
সুবর্ণ সম্বন্ধেও এ কথা খাটে,—
"এমন নির্ম্মল" এমন উজ্জ্বল,
দেবচূড়া ভিন্ন কোথা শোভে বল ?

টিকারীর মহারাণীর মন্দির-চূড়া কনক গঠিত হইলেও শেঠের মন্দির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাহার প্রায় অর্দ্ধেক স্বর্ণ নির্ম্মিত এবং উজ্জ্বল প্রভাকর কিরণ যখন

তাহার উপর পূর্ণ ভাবে প্রতিফলিত হয়, তখন সে হাস্যময় উচ্চ দীপ্তির দিকে দৃষ্টিপাত করা যায় না। সে সৌন্দর্য্য আপনার গৌরবে আপনি মুগ্ধ। পৃথিবীর মলিনতা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

শৈশবে যখন পিসীমার মুখে "রামায়ণ মহাভারতের" পুণ্যময় অপূর্ব্ব কাহিনী শুনিবার জন্য সন্ধ্যা হইতে কত রাত্রি চেষ্টা করিয়া জাগিয়া থাকিতাম তখন বৃন্দা বনের এই "সোনার তাল গাছের" কথা ত কতবার শুনিয়াছি। তাঁহার অমৃতপূর্ণ স্নেহের সহিত মিশ্রিত হইয়া তখন সে "সোণার তালগাছ" শ্রবণে যেমন মধুর লাগিয়াছিল, আজ তাহা শেঠের দেবালয় প্রাঙ্গণে চক্ষের সম্মুখে শরীরী রূপে বিদ্যমান দেখিয়াও আর তেমন মোহিত হইলাম না। স্মৃতি সুখকর রাজ্যের সে সুধাকাহিনী এখন কেবল অস্ফুট স্বপ্নসম বোধ হয়।

শেঠের প্রকাণ্ড ঠাকুর বাটীর পশ্চাতে একটী সুদীর্ঘ সুন্দর দীর্ঘিকা আছে। তাহার ঘন কৃষ্ণ বারিরাশি নিদাঘের মেঘমালা সদৃশ শোভাময়। সেই

সলিল-হৃদয় মথিত করিয়া কত রাজহংস হংসী ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে; যেন মানস-সরোবরে বিকশিত শ্বেত শতদল ফুটিয়া রহিয়াছে। তাহা একবার দেখিয়া সাধ পূর্ণ হয় না, যতবারই দেখিবে ততবারই অতৃপ্ত নয়ন ফিরাইতে পারিবে না। কেমন সে মাধুরী এখনও আমার মানসনেত্রে দীপ্তি পাইতেছে।

দর্শক কিম্বা যাত্রীগণের আমোদার্থে একখানি ক্ষুদ্র বোটও সেখানে যত্নপূর্ব্বক রাখা হইয়াছে, ইচ্ছা করিলে সায়াহ্নে তাহাতে আরোহণ করিয়া "জল-খেলা" করা যায় কর্ণধারহীন সে 'সাধের তরণী তরঙ্গে" পড়িবার ভয় নাই। বসন্তের মারুৎ হিল্লোলে সে তরী আপনি ভাসিয়া যায়, "কুল ত্যজিয়া" গেলেও "আতঙ্কে মরিতে" হয় না।

"মোচার খোলার মত ছোট নৌকা খানি, চলে যেন নাচিয়া নাচিয়া।" "গগনের ঘন গরজনে" কিম্বা "খর সমীরণে" অদ্যাপি কোন বিপদ সে দীর্ঘিকা সাগরে ঘটে নাই।

শেঠজীর দেবনিকেতনের ভিতরও প্রত্যহ সকাল

বিকালে কাছারী হয়। এখানেও অনেক ভৃত্য এবং পরিচারক ব্রাহ্মণ আছে।

বৃন্দাবনের কোন বিগ্রহ দর্শনেই কিছু দিতে হয় না। বিগ্রহস্বামীগণ এই সকল দেব দেবীর জন্য অকাতরে প্রচুর অর্থদান করিয়া এবং জমীদারী লিখিয়া দিয়া গিয়াছেন। দাতাদিগের বংশধরগণ ইচ্ছা করিলেও সেই সব "দেবোত্তর" এবং "ব্রহ্মোত্তর" কাড়িয়া লইতে পারেন না। নিয়ম বড় কড়াক্কড় নাকি।

অন্যান্য মন্দিরের বিষয় বলিতে বলিতে "সাহাজীর" চিত্রময় সুন্দর মন্দিরের কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। এই মন্দিরের বাহিরে এবং ভিতরে নব নব প্রকার খোদিত ও চিত্রিত মূর্ত্তি আছে। তাহা সুনিপুণ ভাস্কর কিম্বা দক্ষ চিত্রকর হস্তজাত না হইলেও দেখিতে প্রীতিকর। কেমন একটু নবীভূত কল্পনা তাহাতে রহিয়াছে, দর্শক নয়ন রঞ্জন প্রতিমূর্ত্তি গুলিতে ভারতীয় কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার একটী চিত্র আমার বড়ই ভাল লাগিয়াছিল; তাহা এই ঃ—অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের সহ রথারোহণে শূন্য-

মার্গে উঠিতেছেন, বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর, সুশীলা সুভদ্রা সখীগণ সহকারে সরোবর হইতে স্নাত বসনে গৃহে আসিতেছেন, সদ্য স্নানে বদন মণ্ডল লোহিতরাগে রঞ্জিত হইয়াছে, এমন সময় পথে অর্জ্জুনকে দেখিতে পাইলেন। উভয়ে উভয়কে দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন, কিন্তু কথা বার্ত্তা কহিতে সুবিধা হইল না, স্বয়ং ভগবান রথোপরি আরূঢ়। দেখিতে দেখিতে রথ বায়ুবেগে ছুটিতে লাগিল, অর্জ্জুন মুখ ফিরাইয়া নিম্নদৃষ্টে রহিলেন, রথ অদৃশ্য হইয়া গেল। লজ্জা-শীলা সুভদ্রা দৃষ্টির সীমায় প্রিয়তমকে আর দেখিতে না পাইয়া পদতলে আঘাত লাগিয়াছে বলিয়া রাজ-পথেই দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। চতুরা সহ-চরীগণ তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া পরস্পরে তাকাতাকি ও হাসাহাসি করিতে লাগিল। দেবী সুভদ্রা তাহাদিগের পরিহাসে কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিতে দ্রুতপদে গৃহাভিমুখে চলিলেন।

"সাহাজী" পরমভক্ত। প্রতিদিন শত ব্রাহ্মণের পদধূলি তাঁহার মস্তকে পড়িলে তিনি পরলোকে পরি-

ত্রাণ ও মুক্তিলাভ করিবেন আশায় নিজের এবং পত্নীর কল্পিত প্রতিমূর্ত্তি দেবালয়ের বারাণ্ডায় খোদিত করাইয়াছিলেন। সোপান হইতে বারাণ্ডায় উঠিতেই সেই যুগল মূর্ত্তিশিরে পদস্পর্শ হয়। তাঁহাদিগের মস্তক অতিক্রম করিয়া কোন প্রকারেই যাওয়া যায় না, এমনি ভাবে তাহা খোদিত।

হায়! অদ্য এই পূজা পাইবার উপযুক্ত ব্রাহ্মণ কে? ভারতের অতীত যুগের গৌরবময় কীর্ত্তির সহিত সেই আরাধ্য ব্রাহ্মণবংশ লোপ পাইয়াছে। এখন কেবল ভাগীরথীর দুই কূলে জীবিত শব মাত্র বিদ্যমান। জীবনের চিহ্নহীন উচ্চতম ব্রাহ্মণবংশের হীনতা দর্শন করিয়াই ব্রাহ্মণ কবি হেমচন্দ্র বিষাদে গাইয়াছিলেন,—

“কি হবে রোদন করিলে এখন!
স্বাধীনতা ধন গিয়াছে যখন,
চোরে শিরোমণি করেছে হরণ
তখনি সে সাধ ঘুচে গিয়াছে”

আমিও কবির বিলাপের সঙ্গে একতানে বলি ;

"নাহি কি সলিল হে যমুনে, গঙ্গে,
তোদের শরীরে উথলিয়া রঙ্গে
কর অপসৃত এ কলঙ্ক রাশি
তরঙ্গে, তরঙ্গে, অঙ্গ, বঙ্গ নাশি
"এ ব্রাহ্মণ বংশ" ডুবাও জলে।"

আগ্রা হইতে আরম্ভ করিয়া দিল্লী পর্য্যন্ত প্রায় সর্ব্বত্র শ্রীরামভক্ত মনুষ্যের পূর্ব্বপুরুষ বানর কুলের দর্শন পাওয়া যায়। ইহারা পালে পালে গৃহদ্বারে—সুবিধা হইলে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া কতরূপে আপ্যায়িত করে কখন ছাতা, কখন জুতো, কখন বা ঘটী বাটী আত্মসাৎ করিয়া গৃহস্থের সহিত বন্ধুতা করিতে চায়। এই অযাচিত বন্ধুগণ গৃহস্থদিগের জোর জবরদস্তিতে বশীভূত হইবার পাত্র নহে। এই "হাউস ট্রেস পাসে" ভারতীয় পিনালকোডের ৪৪৮ ধারা প্রয়োগ করিয়া কোন "সেণ্ট্রাল জেলে" ইহা-দিগকে রাখিয়া দিলে ইহারা সংশোধিত হয় কি না বলা যায় না। মথুরা বৃন্দাবনে ডার্বিনের (Mr. Darwin)

শুভাগমন হইলে মনুষ্য যে বানর বংশ সম্ভূত, একথা তিনি অনায়াসেই সআইন ভাবে প্রমাণ করিয়া যাইতে পারিতেন। শুনিয়াছি, পণ্ডিতবরের আদি পিতামহের সহিত আকৃতিগত নিকটতর সাদৃশ্য ছিল। বৃন্দাবন মথুরার বানরগণের দৈনিক কার্য্য কলাপের বিষয় কোন পশুপ্রিয় দার্শনিক যদি একখানি ইতিহাস লেখেন, তাহা হইলে এই "পুরুষ প্রধান" দিগের রহস্যময় চতুর বিজ্ঞতার বিবরণ সাধারণে কতক জানিতে পারে, নতুবা পশুত্ব ভাবুকতাহীন লেখকদিগের দ্বারা এ জাতির বুদ্ধির উদ্ধার সম্ভবে না।

বিগ্রহ দর্শন করিতে যাইবার পথে অসংখ্য ভিখারী দ্বারা আক্রান্ত হইতে হয়, এবং তাহাদিগকে কিছু না দিয়া এক পদ অগ্রসর হইবার সাধ্য নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালক বালিকারা আবার নাচিয়া নাচিয়া ভিক্ষার্থে এই সকল গান করে ;—

"ধূলা নয়, ধূলা নয়, গোপীর পদরেণু,
এই ধূলা মেখেছিল নন্দের বেটা কানু।"

"মধুর মধুর বংশী বোল এই বৃন্দাবন,
শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, গিরি গোবর্দ্ধন।"

এ গীত শিশুকণ্ঠে সুললিত-শ্রুতিসুখকর বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পয়সায় না কুলাইলে গীতের পরিবর্ত্তে "লালাবাবুর সদাব্রতে" গিয়া দিনপাত কর। এবম্বিধ প্রিয় আশীর্ব্বাদে (?) পরিতৃপ্ত হইতে হয়, তীর্থ স্থানের এই সকল "জাত-ভিখারী" অতিশয় বিরক্তজনক। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বস্ত্রাদি পরিয়া রাজ-পথের সম্মুখে দেবালয়ে যাইবার বিঘ্নস্বরূপ দাঁড়া-ইয়া থাকে। ইহাদিগকে দেখিয়া দয়া অনুকম্পায় পরিণত হয়। সরকার বাহাদুর অহিতকর কুলি আইন ইত্যাদি লইয়া চাকরদিগের সন্তোষার্থে মস্তিষ্ক বেশি মাত্রায় ব্যয় না করিয়া যদি এই সকল অক-র্ম্মণ্য জাতির নিমিত্ত কোন কার্য্যালয় বা কারখানা,— বিলাতের গরিবের জন্য যেরূপ আছে, খুলিয়া দেন এবং আইন দ্বারা রাজপথে ভিক্ষা নিষেধিত হইয়া যায়, তাহাতে কত স্থায়ী উপকার হয়।

বেলা যখন দুই প্রহর, তখন দেবভোগের শাঁক

ঘণ্টা কাঁসর নাদে চারিদিকে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, ও আবাল বৃদ্ধ স্ত্রী পুরুষ ভিখারীদল, কলরবে লালাবাবুর "সদাব্রতে" ও অন্যত্র ধাবিত হইল। আমরা সেই জন-স্রোতভেদ করিয়া শূন্য বাসায় আসিলাম।

দিবা নিদ্রায় ক্লান্তি দূর করিয়া সায়াহ্নে আবার আমরা বৃন্দাবন ভ্রমণে বহির্গত হইলাম। পথেই "বংশী বট" নামক জীর্ণ শীর্ণ একটী প্রাচীন বটবৃক্ষ। গোপীনাথ ইহাতে নাকি বাঁশী রাখিতেন,তাহার পরই "গোপেশ্বর" শিব। প্রবাদ এই, বৃন্দাবনে গোপিনীগণ সহ নটবর মাধব একদা নৃত্য গীতে মত্ত, এমন সময় মহাদেব সেই নৃত্য গীতে মুগ্ধ হইয়া স্বর্গ হইতে নারী রূপে মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ হন এবং সেই বিলাস বলে (Ball) যোগ দেন। কাশীশ্বর নৃত্য গীতে সুনিপুণ, তাঁহার সেই অপার্থিব নাটনে সব সখীগণ চমৎকৃত হইয়া মুখ চাহিতে লাগিল, তখন ভাবে ভোলা নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ছদ্মবেশে রমণীগণের সহিত যে নৃত্য করিয়াছিলেন, সে জন্য

লজ্জানুভব করেন, কিন্তু উদারহৃদয় গোপিনীমোহন তাহাতে পরিতুষ্ট হইয়া পার্ব্বতী নায়ককে গোপেশ্বর নাম দিয়া বৃন্দাবন-ধামে বাস করিতে অনুমতি দেন। এখানে সবই রাধাকৃষ্ণের প্রতিমূর্ত্তি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে রহিয়াছে, কেবল এই "গোপেশ্বর মহাদেও" সেই একচেটিয়া রাজত্বে অন্যেকত্ব দূর করিয়াছেন। "ব্রহ্মকুণ্ড ও কালিয়াদহ" প্রভৃতি দর্শন করিয়া পরি-শেষে আগ্রহ সহকারে "নিধুবন" নিকুঞ্জ বনাভিমুখে চলিলাম। "বসন্তের নিত্যবাস, সঙ্গীতের চিরোচ্ছ্বাস" সুখের পূর্ণ নিকেতন এই বন, বনভূমি নহে। নন্দন পারিজাত পরিমলময় কুসুমকুল প্রস্ফুটিত, লতা পত্রে পরিশোভিত এই কুঞ্জবন অমর বাঞ্ছিত দিব্যধাম। কত ফলপ্রদ বৃক্ষাবলী সাদরে সলজ্জ লতিকা হৃদয়ে ধারণ করিয়া মুগ্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। সেই সকল তরুর শ্যামপত্র মাঝে কলকণ্ঠ পিককুল কূজনে অদৃশ্যে সঙ্গীত-তরঙ্গ বিস্তার করিয়া মোহে আচ্ছন্ন করিতেছে। তাহারা এ সংসারের জীব নহে। শাপ-চ্যুত দেবশিশু মনুষ্য মনের সন্তাপ অপহরণ করিতে

যেন ঐ নব পল্লবিত তরুশিরে আশ্রয় করিয়াছে। শোক জ্বালায় দুঃখী মানব যখন সেখানে যাইবে, তখন এই সুরশিশুগণ স্বর্গের পবিত্র সমাচার, সঙ্গীতে শুনাইয়া মুক্তির পথ দেখাইয়া দিবে। উভয় কুঞ্জ ভিতরেই প্রস্তর প্রথিত সিংহাসন রহিয়াছে। প্রতি নিশায় পুষ্পমালায় ও দীপাধারে ভক্তবৃন্দ তাহা সজ্জিত করিয়া রাধাকৃষ্ণের অদ্যাপি নিশীথ সমাগমের পরিচয় দেয়। "নিধুবন" ও নিকুঞ্জবন উভয়ের মধ্যেই কুণ্ড আছে। বনবিহারে একদা মাধব বিনোদিনী ক্লান্তভাবে প্রিয়তমের নিকট শীতল পানীয় চাহিয়াছিলেন। সেই অসময়ে তৃষ্ণা নিবারণের জন্য কোন উপায় না দেখিয়া মদনমোহন ললিতা ও বিশাখার করস্থিত বংশী দ্বারা কুণ্ড খনন করিয়া প্রণয়িনীর পিপাসা দূর করিয়াছিলেন। তাই এই বিহারভূমে "ললিতা" ও "নিধুবনে" বিশাখা কুণ্ড বিদ্যমান। দুই কুণ্ডই পাষাণ সোপান যুক্ত ও নীল সলিলে শোভা পূর্ণ।

কুঞ্জবনের প্রবেশ দ্বারে কপিকুল প্রহরী স্বরূপ বসিয়া থাকে, আহারীয় মিষ্টান্ন দক্ষিণা না দিলে

তাহারা কখনও দ্বার ছাড়িয়া দেয় না। খাদ্য দ্রব্য দিবামাত্র কেমন আদরে কৃতজ্ঞতা জানাইতে দূরে দূরে সরিয়া যায়, কাহাকেও কিছু বলে না। দুইবনের দুই দল ও দলপতি আছে কোন্‌টা কনজার্ভেটিব (Conservative) কোন্‌টা লিবারেল (Liberal) তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। মাঝে মাঝে লোকে পরিহাস-চ্ছলে তাহাদিগের "লড়াই" বাধাইয়া দেয় এবং যে দল জয়লাভ করে, তাহার বানরদিগকে দলপতিসহ ভোজন করায়।

আরতি না দেখিয়াই সন্ধ্যার ললিত মধুর সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে করিতে "সন্ন্যাসীর আখড়া" হইয়া আমরা সে দিনকার মত, কেন, যেন চিরদিনের তরে পুণ্যক্ষেত্র বৃন্দাবনের নিকট বিষাদে সজল নেত্রে বিদায় গ্রহণ করিলাম।

"ললিত লবঙ্গ লতা পরিশীলন কোমল মলয় সমীর" বাহিত, চির হাস্যময়ী প্রকৃতি রাজ্ঞীর নিবাস ছাড়িয়া আবার সংসারে আসিতে হৃদয়ের পরতে পরতে নৈরাশ্যের অন্ধকারে ছাইয়া ফেলিল। বস-

ন্তেই বর্ষা আসিল—এখন ভিক্ষা কেবল প্রভু তোমার পদতলে চিরনিদ্রা——

গৃহহীন পান্থ শালে
কাটে দিন গোলমালে
বিভবের শূন্য গরিমায়,
অশ্রুভরা হাসি মুখে
যন্ত্রণা অনল বুকে
ক্লান্ত নিতি মুক্তি ভাবনায়।

(বিদায়।)

নিস্তব্ধ নিশার শেষভাগে, অস্ফুট চন্দ্রালোকে, নীরব বিষণ্ণ অন্তরে যখন আমরা সুষুপ্ত বৃন্দাবন ও মথুরার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া কীর্ত্তির মহা শ্মশান ইন্দ্রপ্রস্থাভিমুখে যাত্রা করি, জানি না কেন তখন জননী জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া কোন অজ্ঞাত দূর-দেশে যাইতে মন যেমন সহজে অগ্রসর হইতে চাহে না, সেইরূপ সেই তীর্থস্থান পরিহারে আমার হৃদয়

ব্যথিত হইল। অগণিত তারকাপুঞ্জ মস্তকোপরি, নিম্নে কলনাদিনী পুণ্যসলিলা যমুনা এবং পার্শ্বে পার্শ্বে কাঞ্চনচূড় অসংখ্য দেবমন্দির, কিন্তু নিরানন্দ-মানস-জনিত এ সকলই আমার নেত্রে শোভাহীন বোধ হইতে লাগিল। সুচারু যমুনা-সেতুর উপর হইতে নিশীথ অন্ধকারে পশ্চাৎগামী মথুরাপুরী দেখিতে বড় মনোহর এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে নিশাব-সানের দেব-মন্দিরাগত নহবৎধ্বনি অতীব শ্রুতি-সুখ-দায়ক। তবে নৈরাশ্যের ঘোর অমাবস্যায় এ সবই যেন কেমন ছায়াময় করিয়া ফেলিল; তাহা আজি বাল্যজীবনের আধভাঙ্গা স্বপ্নবৎ স্মৃতিতে কখন কখন জাগিয়া উঠে মাত্র।

অশ্ব শকটের বিশাল ঘর্ঘর শব্দ সহসা থামিলে ট্যাক্স দারোগার (Toll officer) ভীম বদন দর্শনে আম র চমক ভাঙ্গিয়া গেল। তখন বুঝিলাম যে, আমরা ষ্টেসনের অতি নিকটে। রজনী প্রভাতেই ষ্টেসনে পৌঁছিলাম।

হাস্যময়ী উষার সুস্নিগ্ধ বসন্তমলয়মারুৎ সেবনে

যেন অনুপ্রাণিত হইয়া, আবার আমরা দিল্লীগামী দ্রুততর বাষ্পীয় যানে উঠিয়া, নানা প্রকার দৃশ্যময় গ্রাম নগরী দেখিতে দেখিতে, ঠিক বেলা দ্বিপ্রহরের সময়েই দিল্লী গিয়া অবতরণ করিলাম। এই পথের সকল স্থানের নাম গুলিই বেশ সুন্দর। তন্মধ্যে আলিগড় একটী প্রাচীন ঐতিহাসিক ও আধুনিক অতি সমৃদ্ধিশালী স্থান। এই আলিগড়ের বিখ্যাত মৃত্তিকা-দুর্গ ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ডলক অধিকার করিয়াছিলেন ও নগরের অনতিদূরে অদ্যাপি তাহার চিহ্ন আছে। এখানে বহু সংখ্যক ধনী মুসলমানের বাস এবং কলেজ প্রভৃতি থাকায় বেশ জ্ঞানালোচনাও এখন হইয়া থাকে। অনেক বাঙ্গালী কার্য্যোপলক্ষে এখানে আসিয়া লোক জনের নিকট সমুচিত সম্মান লাভ করিয়া সগৌরবে রহিয়াছেন।

আলিগড়ের প্রস্তর-বিনিন্দিত মৃণ্ময় পাত্রাদি বড় সুন্দর এবং সে জন্যও ইহা সর্ব্বত্র বিশেষ প্রসিদ্ধ। ষ্টেসনে দলে দলে বিক্রেতাগণ সে সকল দ্রব্য সামগ্রী লইয়া আসিয়া দর্শকের দৃষ্টি ও হৃদয় আকর্ষণ করে।

কিন্তু অধিকাংশ বাঙ্গালী কেবল তার দরমাত্র করেন, ক্রয় করেন কেবল ইংরাজ স্ত্রী পুরুষ।

দিল্লী হিন্দু এবং মোগল গৌরব বিকাশের পূর্ণ শেষ নিদর্শন হইলেও, তাহাতে নামিয়া আমরা যেন নিতান্ত-পরিত্যক্ত অনুভব করিতে লাগিলাম ও তখন পাণ্ডাঠাকুরদিগের সময়োচিত সাহায্য ও উপকারিতা আরো গভীর রূপে মনে জাগিতে লাগিল। এখানেও হিন্দুর সরাই আছে এবং "ময়ুর সরাই" তন্মধ্যে প্রধান; কিন্তু বাঞ্ছনীয় নির্জ্জনতা অভাবে আমরা সেখানে যাইতে অস্বীকার করিয়া এক জন ফিরিঙ্গী পাদরীর ক্ষত্রিয়-রক্ষিত হোটেলের দ্বিতল অংশে বাসা লইলাম। তাঁহার বন্দোবস্তের সুবিধায় আমাদিগের সেখানে কোনই কষ্ট পাইতে হয় নাই। পাদরী সাহেবটী অতি ভদ্র লোক। অযাচিতরূপে সময় মত সকলি পাওয়া যাইত। তাঁহার কিছু ত্রুটি ছিল না। যদিও বহুদিন হইতে মুসলমান জাতির সহিত আমরা নিকটতর সম্বন্ধ-সূত্রে আবদ্ধ, এবং তাঁহারা আমাদিগের ভ্রাতৃস্থানীয়, যদিও পুরাকালে হিন্দু

রাজপুত-কন্যার সহিত মোগল সম্রাটগণের পবিত্র পরিণয়ও হইত, এবং বাদসাহ দরবারে কত উচ্চ উচ্চ রাজপদ অযাচিতে লাভ করিয়া হিন্দুগণ সম্মানিত হইতেন এবং অদ্যাপিও কত কত রাজন্যবর্গ দিল্লীশ্বরের কৃপায় সর্ব্বত্র পূজিত হইতেছেন, তবু বলিতে পারি না কেন, এই হোটেলের যবন ভৃত্যদিগকে আমি কোন মতেই বিশ্বাস করিতে পারি নাই, এবং তাহাদিগকে স্বকার্য্যে রত দেখিয়াও আমার হৃদয়ে সন্দেহজনিত অসুখ অনুভব হইত। বড়ই দুঃখের বিষয়, হোটেলের একজন 'আরদালি' মুসলমান সুচারুরূপে আমাদিগের বাহিরের সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন করিয়াও আমার বিশ্বাসভাজন হয় নাই।

আমাদিগের হোটেলের অপর অংশে মহারাজ হোলকারের কয়েকজন "মোসাহেব" বাসা লওয়াতে এখানে আমরা আশাতীত নিরাপদ হইয়াছিলাম।

নানা কথায় এক কৌতুকাবহ ঘটনার উল্লেখ করিতে ভুলিয়া গিয়াছি। তখন ভিসি (Veasey) সাহেবের অভূতপূর্ব্ব গোপনীয় সারকিউলার "অঙ্গ বঙ্গ

কলিঙ্গে” জারি হয় নাই ও কূটনৈতিক ডফারিণ মহোদয় “ফ্রণ্টিয়ার পলিসি” এবং ব্রহ্মজয়ে বিব্রত হইয়া স্বদেশাভিমুখে অকালে অপসৃত হইবেন; ইহাও কেহ জানিত না। সে যাহা হউক, আমরা ট্রেণ হইতে নামিয়া ষ্টেসনের বাহিরে পা দিবা মাত্র সহসা কোথা হইতে একজন দক্ষ পুলিশ কর্ম্মচারী, খাতা হস্তে, লেখনী কর্ণে, নাম ধামাদি লিখিয়া লইবার অভিপ্রায়ে আমাদিগের সম্মুখে দ্রুতবেগে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমরা ছদ্মবেশী রুসিয়ান নহি এবং গরিব আমাদিগের দ্বারায় প্রবলপ্রতাপ বৃটিশ সিংহের অপ্রতিহত সাম্রাজ্যের কোনরূপ যে বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা বা আশঙ্কা নাই, একথা বিশদরূপে বুঝিয়াও সে ব্যক্তি, তাহার প্রভুকে মিষ্ট ভাষায় গালি দিতে দিতে সরব বিনয়ে নিজ “ডিউটি” (Duty) করিয়া, সেই সঙ্গেই আবার ভাগ্যদোষে এই অসার কার্য্যেও গৌরাঙ্গ প্রভুর নিত্য অপমানের তাড়নায় জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে বলিয়া কত কি আক্ষেপ করিতে লাগিল। তাহারই প্রমুখাৎ শ্রুত

হইলাম যে, দিল্লী রাজসূয়, দরবারের পরে বড় লাটের হুকুমে নাকি এই "রূল" হইয়াছে। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা অপহরণ এবং অস্ত্র আইন বিধিবদ্ধ করিয়া সুনীতি-বিশারদ লীটন বাহাদুর যে কীর্ত্তিধ্বজা উড়াইয়া গিয়াছেন, তাহাতেই তাহার নাম ভারতে চিরস্মরণীয়। আর এটা সেটা "রূল" টানিবার প্রয়োজন ছিল না।

মদ্যপায়ী যথেচ্ছাচারী বামাচার-সম্প্রদায়ের বিনাশার্থে এবং পাপীর মুক্তি তরে যেমন পুণ্যবতী জাহ্নবী-হৃদয়ের 'জ্ঞানালোক-প্রদীপ্ত পবিত্র নবদ্বীপ ধামে,—মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের 'নদীয়াপুরে' শ্রীগৌরাঙ্গ দেবাবতারের আবির্ভাব, তেমনি লীটন-শাসন-প্রপীড়িত দগ্ধ ভারতে শান্তিবারি সিঞ্চনার্থ মহাত্মা লর্ডরিপণের শুভাগমন হইয়াছিল। ইংরাজশাসিত ভারতরাজ্যে, সাম্যের মহামন্ত্রে অনুপ্রাণিত করিয়া নববিধি প্রচার করিতে তিনি ঈর্ষান্বিত স্বজাতির বিরাগ ভাজন হইয়া, অসময়ে, ব্যথিত অন্তরে ভারত ভূমি পরিত্যাগে বাধ্য হইলেন। কিন্তু এখন সে কথা যাউক।

ইন্দ্রপ্রস্থ ও দিল্লী।

ধন, মান, সুখ, সম্পদ, বীরত্ব ও পুণ্যময় স্বাধীনতার একত্রীভুত সমষ্টি, স্মৃতির পরম আদরণীয় ও কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ এই ইন্দ্রপ্রস্থ। ভীমার্জ্জুন যুধিষ্ঠিরের পবিত্র পদরেণু অদ্যাপি ইহার অণুতে,—প্রত্যেক ধুলি কণা যেন তাঁহাদিগের জীবনকাব্যের পবিত্রতার মধুর কাহিনীর পরিচয় দিতেছে। যুগ যুগান্তরবাহী সমীরণ আজিও যেন ভারতের দ্বারে দ্বারে সেই পূর্ব্বের অতুলনীয় মহিমাগীতি গাইয়া বেড়াইতেছে,—দুর্ভাগ্য দাসত্ব-জীবী মৃতপ্রায় আর্য্য সন্তানের পুনর্জ্জীবন দান করাই যেন তাহার অভিপ্রায়। অতীতের সে সঞ্জীবনী সুধা-গীতে যদি আবার ভারতে নবজীবন সঞ্চার হয়, আবার যদি তাহাতে নিদ্রিত ভারতবর্ষ উৎসাহানলে জ্বলিয়া উঠে, তবেই চির বিশ্বস্ত বায়ু কৃতার্থ হইবে।

ইন্দ্রপ্রস্থ এবং দিল্লী দুইটী বিভিন্ন নগরী ও অতি সামান্য পথ মাত্র ব্যবধান। পরবর্ত্তী আর্য্য পুত্রগণ

পূজনীয় ইন্দ্রপ্রস্থের শেষ রেখাও যে আর দেখিয়া জীবন সার্থক করিবেন, সে আশা বড় কম। ভারতের মানচিত্রে তাঁহার প্রতিকৃতি বহুদিন লোপ পাইয়াছে, কেবল স্মৃতিযোগে ভগ্ন-প্রস্তরে ইন্দ্রপ্রস্থ দেখিতে পাওয়া যায়।

যুগান্তরের সাক্ষী-রূপী এই যে অযুত অযুত রাজপুত বীরের লীলাক্ষেত্র দিল্লীনগরী—এই শরীরী স্বপ্নময় কীর্ত্তির মহা শ্মশানে দাঁড়াইয়া অদ্য যদি আমি অভ্রভেদী স্বরে ক্রন্দন করি, তবে আমার সে মর্ম্মান্তিক করুণ রোদন ধ্বনি কাহার প্রাণ স্পর্শ করিবে? কে আমার হৃদয়ের গভীর বেদনা বুঝিবে বল?

"ভারতে জীবন নাই, শব রাশি রাশি জহ্নবীর দুই তীরে।" চারিদিকে ভগ্নাবশেষ, সর্ব্বত্র শ্মশান, ধূ ধূ করিয়া চিতানল জ্বলিতেছে, তাহাতে আশা ভরসা, উৎসাহ, উদ্যম অনুদিন পুড়িয়া পুড়িয়া সব ভস্মীভূত হইয়া যাইতেছে। মনে হয়, কুরুক্ষেত্র মহা সমরে যে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে, আজও যেন সেই জ্ঞাতি-বিরোধরূপ-সর্ব্বগ্রাসানল নির্ব্বাপিত হয় নাই। জীব-

নের পার্থিব মায়া পরিহার করিয়া "সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং, শস্য শ্যামলাং" পবিত্র মাতৃভূমিকে প্রাণ-পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পূজা না করিলে অদ্যকার এ দুর্গতি আর ঘুচিবার নয়।

"ছিল বটে আগে তপস্যার ফলে।
কার্য্য সিদ্ধ হতো এ মহীমণ্ডলে॥
এখন সে দিন নাহিক রে আর।
দেব আরাধনে ভারত উদ্ধার—
হবে না হবে না"

ইহাই পরীক্ষিত সত্যস্বরূপ মনে বিশ্বাস করিয়া স্বকার্য্য উদ্ধারে বদ্ধপরিকর হইতে হইবে।

এখনও "বিংশতি কোটি" ভারত সন্তান একমন, এক প্রাণে, সাম্যমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সাধনা করিলে অবশ্যই সিদ্ধ-মনোরথ হইতে পারেন।

দৃশ্যময় মহানগরী দিল্লী সম্বন্ধে নূতন করিয়া কোন কথা বলিবার না থাকিলেও, প্রত্যেক আর্য্যসন্তানের নিকট তাহার কথা প্রতিবারই নূতন। আমার নয়নে এস্থান একটী অভিনব পুণ্যতীর্থ।

কাব্য ইতিহাস পুরাণে, কথায় কি উপকথায়,

আশৈশব যাহার গৌরব-বৃত্তান্ত শুনিয়াছি, সেই হিন্দু মুসলমানের কীর্ত্তিমান স্মৃতি-চিহ্ন, দিল্লীর প্রাচীন সৌধ-মালা এখনও রমণীয় শ্রীসম্পন্ন ও পূর্ব্ব-ঐশ্বর্য্য-প্রকাশক। আগ্রা এবং দিল্লী যদি একজন পৃথ্বিপতির কল্পনাময় মানস রাজ্য হইত, কিম্বা অমর-শিল্পী বিশ্বকর্ম্মা স্বয়ং একই উপকরণে ইহা নির্ম্মাণ করিতেন, তবুও আকৃতিগত সৌসাদৃশ্যে ইহারা দুইটী পৃথক সুরপুরী। এক জননীর গর্ভজাত দুইটী সন্তান যেরূপ বিধাতার অপূর্ব্ব কৌশলে একাকৃতি-সম্পন্ন নহে, সেইরূপ এই অলৌকিক শিল্পজাত অমরাবতীদ্বয়ও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

পুরাতন প্রাসাদনিচয় এক দিকে যেমন দিল্লীর অনন্ত বৈভবের পূর্ণতার পরিচয় দিতেছে, অন্যদিকে তেমনি-আবার ভগ্ন সমাধি ও ধ্বংসাবশেষ দ্বারা মানব সম্পদের অচিরস্থায়িত্বের কথা নীরবে কহিতেছে। এই জীবন-মৃত্যু বক্ষে ধারণ করিয়া মহানগরী দিল্লী অদ্যাপি দণ্ডায়মান। মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার কলিকাতা আজ ধন, জন, সুখ, সৌভাগ্যপূর্ণ রাজধানী, আর দিল্লী প্রাচীন স্মৃতির গৌরব-রাজ্য, শাপভ্রষ্ট সুরধাম।

দিল্লীর ইংরাজ-নির্ম্মিত নূতন অট্টালিকাগুলি কলিকাতার সহিত তুলনায় কিছুই নহে। রাজপথ ও জনকোলাহল পরিশূন্য এবং এদিক সেদিক বৃহৎ বৃহৎ প্রান্তর শ্যামল দুর্ব্বাদল ও ছায়াময় তরুরাজি বিহীন,—প্রচণ্ড রবিকরে যেন সব দগ্ধপ্রায়। রাজপথে জলসিঞ্চনের চিহ্ন মাত্র নাই। নিম্নে নীলাঙ্গিনী যমুনা, মৃদু কল্লোলিনী, কিন্তু সে কল্লোল-মন্থরগমনে জীবনের অপূর্ণ-বাসনা, মানসে জাগিব জাগিব করিয়া, আবার বিস্মৃতি সহ মিলাইয়া যায়। তাহাতে সুখ নাই, কেবল যন্ত্রণা।

গজদন্ত-বিনির্ম্মিত বিবিধ কারুকার্য্যের সজ্জিত বিপণী রাজপথবাহী দর্শকগণের দৃষ্টি আকর্ষণকারী। সেই বিচিত্র সৌন্দর্য্য দুর্ম্মূল্যও নহে। সকলেই তাহা ক্রয় করিয়া সুখী হইতে পারেন।

“দিল্লীকা-লাড্ডু যো খায়া ওবি পস্তায়া যো না খায়া ওবি পস্তায়া” এই রহস্যবাণী বাল্যকাল হইতে শুনিয়াছি। সেই রহস্যময় মিষ্টান্ন-মিষ্টারী-(Mystery) ভেদাভিলাষী আমরা তাহার মধুরতায় সরস রসনা

পরিতৃপ্ত করিতে যেরূপ উপহসিত হইয়াছিলাম, তাহা আবার নূতন করিয়া জনসমাজে বলিয়া আর লজ্জা পাইতে চাহি না। সে সাধের 'লাড্ডু' ভ্রান্ত পথিকের দন্ত ও জিহ্বা এক বার আস্বাদ করিলে ইহ-জীবনে কখনও ভুলিতে পারে না। তাহার বাহ্যদৃশ্য চমৎকার, কিন্তু ভিতর বালুকা পরিপূর্ণ, সুতরাং তাহা যো খায়া ওবি পস্তায়া, যো না খায়া ওবি পস্তায়া, একথা ঠিক।

এখানে রাজকর্ম্মচারী ও রেলওয়ের বাঙ্গালী ব্যতীত আর সবই প্রায় তদ্দেশীয় মুসলমান। ষ্টেসন মাষ্টারদিগের প্রতি ব্যঙ্গপ্রিয় ধীরাজের গান; "বেটা-দের আলপাকার চাপকান সব দেখিতে পাই" দিব্য স্মরণ থাকিলেও সেই বাল্যসুলভ রাগ তাঁহাদিগের উপর আর নাই। এই পর্য্যটন-বহুদর্শিতায় যাহা দেখিলাম, তাহাতে বাঙ্গালা হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিমাঞ্চলের নানা স্থানের বাঙ্গালী ষ্টেসন মাষ্টার-দিগকে অতি ভদ্রলোক বলিয়া প্রতীতি জন্মিয়াছে। তবে তাহাদিগের নীচকর্ম্মচারী "রেলের" দুচারি জন

বাবু এরূপ সেরূপ বটে। রেলওয়ে ইত্যাদির উচ্চ-কার্য্যে উচ্চশ্রেণীর ভারতবাসীর সংখ্যা যত বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি হইবে, ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল। অহিফেন প্রভৃতি ডিপার্টমেণ্ট এখনও ইংরাজ ফিরিঙ্গীর একচাটিয়া।

চন্দ্র সূর্য্য রশ্মি-হীন, বায়ু-প্রবাহরুদ্ধ অন্ধকূপ-বাসিনী উচ্চবংশীয়া যবন রমণীর মুখ-দর্শন-সৌভাগ্য দিল্লী আসিয়াও আমার অদৃষ্টে ঘটে নাই, তাই—"হরি হরি কেমন করিয়া বলিব, কেমন সেই মুখ-খানি।" তবে ভাগ্যবতী মুসলমানীর ট্রেনারোহণের আপাদমস্তক শোচনীয় অবগুণ্ঠন, "ঘেরা টোপ" ভাবিলে এখনও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, কিন্তু আমোদ এই যে, সেই অপূর্ব্ব মূর্ত্তিমতী লজ্জা, (আব্রু) দাসী পরিবেষ্টিতা হইয়া আল্‌বালা সহ প্লাটফর্ম্মে বিরাজ করে।

ক্রমান্বয়ে ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রথম দিন বাসা পরিত্যাগে অসমর্থতা হেতু পরদিবস মধ্যাহ্নেই তীব্র রবিকর উপেক্ষা করিয়াও আমরা দিল্লী সন্দর্শনার্থ

শকাটারোহণ করিলাম। আমাদিগের মূর্ত্তিমান ছক্র (ছাক্ড়া গাড়ী) সশব্দে লতা পুষ্প সুশোভিত "শিশু-কণ্ঠকূজিত" বিগ্রেড জেনারেলের "কুঞ্জ কুটীরাভি মুখে" যখন প্রধাবিত হইল, আর প্রলয়ের ঝঞ্ঝাবাতে যেন দেশ শুদ্ধ ধূলি রাশি উড়াইয়া চলিল। জেনা-রেল সাহেবের নিকট দুর্গ-প্রবেশের পাস সংগ্রহ করা রীতি। সৈনিক বিভাগের উচ্চ পদস্থ ইয়োরোপিয়ান্‌রা প্রায়ই অধিকাংশ গর্ব্বান্ধ সিভিলিয়ান অপেক্ষা শত গুণে ভদ্রলোক। বীর শোণিত অকারণে কদাপি উষ্ণ হয় না। অসারে উত্তাপ বেশি—ইহা জগতে কেহই অবিদিত নহেন।

লৌহদ্বার।

(গেট।)

দুর্গে প্রবেশ করিতে হইলে এই ভীমকায় অভেদ্য লৌহদ্বার অতিক্রম করিতে হয়। ইহা অচল অটলভাবে

প্রহরী স্বরূপ দাঁড়াইয়া অদ্যাপি যেন রাজপুরী—কেল্লা রক্ষা করিতেছে। দুর্জ্জয় অনীকিনীর অনিবার্য্য তরঙ্গাভিঘাতে তাহার ঐতিহাসিক বিপুল কলেবরে একটু-মাত্র শিথিলতা স্পর্শ করিতে পারে নাই, সে লৌহ-তনু এমনি সুদৃঢ়রূপে গঠিত যে, অতীতের শত শত বীরবাহুর বজ্র প্রহার এবং সমরোন্মত্ত হস্তীর উৎপীড়ন কেবল মাত্র উদার বক্ষে সহ্য করিয়াছে এবং অবিচলিত রুদ্ধ প্রাণে প্রভুর রাজ্য ঝন্ ঝনাৎ শব্দে রক্ষা করিয়া কর্ত্তব্য পালনে রত রহিয়াছে। তাহাকে স্বর্গের প্রথম সোপান, মুক্তির দ্বার বলিতে পারা যায়। এই দ্বার পথে প্রবেশ করিয়া দুর্গ-হৃদয়স্থ বিচিত্র রাজনগরী সহসা চক্ষের উপর প্রভাসিত দেখিলে দ্রবীভূত হৃদয়ও আনন্দে শতধা উথলিয়া পড়ে। বিস্ময় প্লাবিত নেত্র কি ছাড়িয়া কি দেখিবে, তাহা বুঝিতে পারে না, অনিমিষে চাহিয়া চাহিয়া কেবল মুগ্ধপ্রায় হইয়া থাকে।

কেল্লা।

দরবার নিকেতন "দেওয়ানাআম ও দেওয়ানখাস' "রঙ্গমহল মতি মসজিদ" এবং স্নান-ধৌত "হামাম" প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্বনামখ্যাত চারু হর্ম্ম্যে বিরাজিত কেল্লা শারদীয় প্রতিমাসম ত্রিদিব সৌন্দর্য্যে বিভাসিত। কত মণি মুক্তা-প্রবাল ভূষণে এই সকল রমণীয় সৌধমালার কমনীয় কান্তি যেন শশাঙ্ক-জ্যোতি বিকীর্ণ করিতেছে। এখন যদিও সে দিনের সে পৌর্ণমাসী দীপ্তিনিভ জীবন্ত মধুরিমা আজ নাই, তবুও ধরাতলে এ দ্বিতীয় ইন্দ্রালয় অতুলনীয় রূপে চির প্রস্ফুটিত। এ রাজপ্রাসাদ অদ্য পরিত্যক্ত ও জীবনবিহীন নির্জ্জনতায় বিষাদপূর্ণ সম্রাটহীন সম্রাজ্য প্রাণীশূন্য সু-আশ্রম এবং পতি-বিয়োগ-বিধুরা হিন্দুনারী যেমন অশ্রুময় শোকের প্রতিচ্ছায় ইহাও তেমনি।

"হামাম"।

রাজকীয় গৌরবের এবং বাদসাহী বিলাসের চরমোৎকৃষ্ট পূর্ণ নিদর্শন এই অবগাহন মন্দির! শুভ্র মর্ম্মর-বিনির্ম্মিত স্তম্ভময় তিন বৃহৎ মনোহর প্রকোষ্ঠ অতি উপাদেয় প্রস্তর খণ্ডে সুসজ্জিত এবং তাহার প্রতি কক্ষের অন্তরস্থিত কৃত্রিম উৎসময় রম্য সরিৎসহ বহুবিধ নল এমনি সুকৌশলে সংলগ্ন রহিয়াছে যে, তাহাতে বিনা সাহায্যে স্নানকালীন স্বচ্ছ বারি আপনা হইতে নির্গত হয়। কোন নল উষ্ণ, কেহ বা আবার সুশীতল নীরধারা মুগ্ধ প্রাণে বহন করিয়া উৎস সরসী মাঝে সম্মিলিত আলিঙ্গনে উছলিয়া পড়ে। সেই লীলাময় স্নিগ্ধোষ্ণ প্রেম-প্রপাতে চারু অঙ্গ ভাসাইয়া জ্যোৎস্নাময়ী বিদ্যাধরী রূপিণী নৃপেন্দ্রকণ্ঠহার মহিষীগণ যখন জলকেলী করিতেন, তখন সুবাসিত উৎস-সলিলে রূপলহরী আহ্লাদে ছুটাছুটি করিত। চকিত বায়ু গবাক্ষপথে সে সৌন্দর্য্য-চুম্বিত সুরভি মাখিয়া রাজসমীপে বার্ত্তাবহন করিলে, সুবাস-

সেবিত সমীরণে প্রিয়তমার সাঙ্কেতিক স্পর্শানুভবে স্বয়ং দিল্লীশ্বরও চঞ্চলচিত্ত হইতেন এবং সভাভঙ্গে প্রেয়সী বেগম সহিত বিলাসাবগাহনে মধ্যাহ্ন প্রণয়োপভোগ করিতেন। জানিনা, এই শিল্প চারু চির-বসন্তময় শীতল শিলা-হর্ম্ম্যে স্বরভি নির্ঝর-নীরে, প্রিয়-জনমিলিত নিদাঘ মধ্যাহ্ন-স্নান, এ তাপ-দগ্ধ দেশে ঊনবিংশ শতাব্দীর কোন ভগিনী কল্পনায় অনুভব করিয়া হিংসনীয় মনে করেন কিনা ?

"ময়ূর সিংহাসন।"

একে একে হর্ষ বিষাদে আমরা মোগল-গৌরবের চিহ্নগুলি দর্শন করিয়া ক্রমে দুর্গ-পরিহার সময় "ময়ূর সিংহাসন" দেখিতে গেলাম। "দিলীশ্বরো বা জগ-দীশ্বরো বা" পূর্ব্বে যে সিংহাসন আলোকিত করিয়া বসিতেন, সেই দেবদুর্ল্লভ "ময়ূর সিংহাসন" বহুদিবস পারস্যে চলিয়া গিয়াছে। এখন তাহার স্থানে শ্বেত

মর্ম্মর প্রস্তরের এক সামান্য সিংহাসন সাক্ষীগোপাল রূপে রক্ষিত হইয়াছে। রূপ গুণসম্পন্ন একমাত্র প্রিয়পুত্র বিয়োগে ধনবতী বিধবার শূন্যগৃহ যেমন উপ-গণ্ড পোষ্য পুত্রদ্বারা পূর্ণ করা হয়, এও তেমনি। আবার যেমন প্রাণাধিক পুত্ররত্ন জাহ্নবীতীরে জ্বলন্ত চিতায় ভস্মীভূত করিয়া দিয়া, শোকাকুলা জননী, ইহ সংসারে নিজ শিশুর জীবনের ছায়ারূপী পালিত পোষ্যমুখ দর্শনে কখনও দগ্ধ-হৃদয় জুড়াইতে পারেন না, সেই প্রকার পূর্ব্বের সে তপ্ত-কাঞ্চন-গঠিত ময়ূর শরীরে নানাবিধ মণি মাণিক্য-প্রতিফলিত-বর্ণের অপূর্ব্ব সিংহাসনের বিনিময়ে এ ব্যঙ্গাত্মক শিলাসন ভারত-বাসীর নয়নে কেবল মাত্র শোক-চিহ্ন।

সুবর্ণ-খচিত কিঙ্খাপে মৌক্তিক ঝালর শ্রেণীর আবরিত চন্দ্রাতপ তলে বিচিত্র 'বারখাম্বা' বেষ্টিত ময়ূর সিংহাসনে উপবিষ্ট ভারতেশ্বর যেন—

"কনক আসনে বসি দশানন বলী"

যৎকালে 'পাত্রমিত্র সভাসদ' সহ সেই ভূতলে অতুল সভায়, উৎসব দিনে, আমখাসে বাদসাহগণ

ময়ূরাসনে দরবারে বসিতেন, তখন রত্নরাজির রশ্মি-প্রভায় নিশীথে সূর্য্যোদয় হইত এবং বিভাবরী তামসী অঙ্গে ভানুদীপ্তি নিরীক্ষণ করিয়া বিষণ্ণ মনে যেন অনাশ্রয়ে দিল্লীর সুদূর প্রান্তরে একক ঘুরিয়া ঘুরিয়া পথ খুঁজিয়া বেড়াইত।

"জুম্মা মসজিদ্।"

'রত্নসৌধ কিরীটিনী, দুর্গ ছাড়িয়া দিনমণির কিরণ-মালা-শোভিত জুম্মামস্জিদে যখন পৌঁছিলাম, তখন দিবসের কলরব থামিয়া চারিধারে কেবল নীরব শান্তি বিরাজ করিতেছিল, ক্লান্ত আমরা জুম্মার শীতল সোপানে ক্ষণকাল বিশ্রামার্থে বসিলাম। অসময় ভ্রমণে পশ্চিমের দুরন্ত মার্ত্তণ্ড তাপে আমাদিগের মস্তক বড় ব্যথিত করিয়াছিল।

হিন্দুর জগন্নাথ দেবমন্দির এবং মুসলমানের জুম্মা, ভারতীয় সৌধ-জগতে দুই অলৌকিক কীর্ত্তি। এমন

বৃহৎ অপরূপ শিল্পময় ভজনালয় ভারতে কুত্রাপি আর নাই। রাজেন্দ্র-দুর্ল্লভ প্রেমজাত 'অপ্রতিম অপার্থিব' তাজ সমাধি পরে, এই পবিত্র জুম্মা মস্‌জিদ্ অমূল্য মর্ম্মর প্রস্তরে তুষার ধবল লাবণ্যে রচিত। শরচ্চন্দ্রের নির্ম্মল কৌমুদীহাস্য কঠিন শিলাখণ্ডে সযত্নে জমাইয়া যেন জ্যোৎস্নায়, বিরহীর বিজন সঙ্গীতের সুখস্বপ্ন তুলিকায়, স্বর্গ-শিল্পী স্বয়ং ধরণীতে অবতীর্ণ হইয়া, ইহার প্রকাণ্ড বরবপুঃ ললিত পাষাণ পটে চিত্র করিয়া গিয়াছেন। বহু যোজন বিস্তৃত উচ্চ ভূমি অধিকার করিয়া, উন্নত গগন-স্পর্শীশিরে জুম্মা মস্‌জিদ্ এমনি সগৌরবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে যে, দিল্লী মহানগীর সর্ব্বত্র হইতে তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। *

শুভ্র মস্‌জিদ্-প্রাঙ্গণ-সরোবরে পূত যমুনাবারি অন্তঃসলিলে বহিয়া অদৃশ্য-খনিত খাতযোগে ধীরে

---

* "In all Delhi, the highest building is the Jumma Musjeed, towering above every other object, and seen from every part of the city."

Travels of a Hindoo.

ধীরে আসিয়া থাকে এবং বর্ষা সমাগমে বারি পরিপূর্ণ হইয়া উঠে।

"কামিনীর কমনীয় কণ্ঠ ভূষাহারে,
দ্যুতিমান মধ্যমণি যেমন সুন্দর, সেইরূপ"

বর্ষা নীরে উচ্ছ্বসিত এই মানস-সরসী অপ্রতিম শোভা ধারণ করে। নমাজ কালীন বাদসাহগণের, মনের নহে, হস্তপদের পাপমালিন্য প্রক্ষালনার্থে ইহার সৃষ্টি। এখনও কতক পানীয় স্বচ্ছ সলিল ইহাতে দেখিয়া আমরা আগ্রহে তাহা চোখে মুখে সিঞ্চন করিয়া দারুণ তৃষ্ণা এবং পথ শ্রান্তি দূর করিলাম।

সে কালের সৌভাগ্য দিনে বিশেষ কোন পর্ব্বোপলক্ষে, বিংশতি সহস্রাধিক মুসলমান নাকি বাদসাহ সহিত জুম্মা মসজিদে একত্র উপাসনা করিত এবং তাহার ভিতর প্রথিত দুই পৃথক পাষাণ মঞ্চে আরোহণ করিয়া সম্রাটগণ পুরোহিত (মোল্লা) সহ তার-স্বরে সাধারণের নিমিত্ত ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিতেন। সাজাহান ও বাহাদুরসার হস্তাক্ষর "কোরাণ সরিফে" এখানে প্রতিবিম্বিত রহিয়াছে। সুবিখ্যাত জুম্মার

নির্ম্মাণ কার্য্য পরিসমাপ্ত করিতে প্রায় বিংশতি বর্ষ এবং দশ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছে। *

"হেন শান্ত সুপবিত্র আশ্রমে" বাদশাহ আরঙ্গজীব দিবসে একবার যখন রাজকীয় সমারোহে দেবারাধনে আসিতেন, সে সময় দিল্লীর সুপ্রশস্ত রাজবর্ত্ম উৎসাহিত জনস্রোতে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিত, এবং সম্রাট-দর্শনাভিলাষী সচঞ্চল প্রাণী-কল্লোল থামাইতে শান্তিরক্ষকও পরাজয় মানিত।

অদ্যকার এই তমসাচ্ছন্ন নীরব জুম্মা-মন্দিরে দাঁড়াইয়া ভূতস্মৃতি-জীবিত আমি অতীতের সে দৃশ্যময় স্বজনতা কল্পনার দিব্য চক্ষে আমার চারি দিকে যেন জীবন্তরূপে ভাসমান দেখিতে পাইলাম। সে শোভার কাল্পনিক চিত্র আমার দ্রবীভূত হৃদয়কে মন্ত্রমুগ্ধবৎ করিয়া তুলিল—প্রাচীন দিল্লী—প্রাচীন ইন্দ্র-

* The Jumma musjeed was commenced in 1629, and finished in 1648. It is said to have cost ten lacs of Rupees.

Travels of a Hindoo.

প্রস্থ—প্রাচীন রোম-প্রাচীন এথেন্স-প্রাচীন অ-যোধ্যা, তোমরা আজ কোথায়? হায়! কোথায়?

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ-ক্ষিপ্ত সিপাইগণ সদলে জুম্মার পবিত্রশান্তি ভঙ্গ করিয়া তাহাদিগের উন্মত্ত সহবাসে জুম্মাকে হিংস্রক শ্বাপদ-সঙ্কুল ভীষণ অরণ্যে পরিণত করে এবং তাহাকে ধ্বংসপুরে পাঠাইয়া দুরন্ত সিপাইগণকে বিতাড়িত করিবার সময়োচিত রাগান্ধ পরামর্শ ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট কার্য্যে প্রতিপালন না করিয়া অবশ্যই সমগ্র ভারতবাসীর নিকট অশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

রজনী সন্দর্শনে আমরাও বাসায় ফিরিলাম। "শুভ্র জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনীর" নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সুদূর প্রাসাদ শিরে কে তখন গাইতেছিল, তা জানি না, কিন্তু তাহার সে বালকণ্ঠ নৈশ নীলাম্বর প্রতি-ধ্বনিত করিয়া আমার প্রাণের ভিতর প্রবেশ করিল। তাহাতে এক যুগের সুখ দুঃখের অস্ফুট স্মৃতি জাগিয়া উঠিলে, সকল দিনের প্রিয়দৃশ্য বিস্মৃতি ছায়ায় রাখিয়া দিয়া, সেই সঙ্গীতের স্বরস্রোতে আমি কোথায়

ভাসিয়া গেলাম, বলিতে পারি না। সে গীত যে না শুনিয়াছে, তাহার জীবনই বৃথা। বৈষ্ণব কবিগণই যথার্থ প্রেমিক।

(সুহই।)

"বঁধু কি আর বলিব আমি,
জীবনে, মরণে, জনমে জনমে,
প্রাণনাথ হৈয় তুমি।
তোমার চরণে আমার পরাণে,
বান্ধিল প্রেমের ফাঁসি,
সব সমর্পিয়া এক মন হৈয়া,
নিশ্চয় হলাম দাসী।"

চণ্ডীদাস।

(ধান্‌সী।)

"রূপ লাগি আঁখি ঝরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পীরিত লাগি থির নাহি বান্ধে।"

জ্ঞানদাস।

এই অপূর্ব্ব মহাজন পদাবলী—প্রেমগীতে নিরাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার করে, ভাবুকের চিন্তাস্রোতে

নব নব ভাব-লহরী তুলিয়া দেয়, এবং প্রবাস-পীড়িত প্রণয়ী-প্রাণে মিলনের স্পর্শমণি ছুঁয়াইয়া যায়, তখন জাগ্রতে কি স্বপ্নে প্রিয়-সমাগম-সুখানুভবে কল্পনার মানস মন্দিরে বিরহীর দগ্ধচিত্ত জুড়াইয়া থাকে। প্রেমের এই পূর্ণ-বিকশিত আত্মহারা সঙ্গীত যদিও আমার নিকট—"A voice, a mystery", তবু আমি সেই অপরিচিত অদৃশ্য গায়ক কিম্বা গায়িকাকে বলি—

"O blessed Bird! the earth we pace
Again appears to be
An unsubstantial, faery place;
That is fit home for Thee!"

"হুমায়ূ মাকবারা"

(বাদসাহ হুমায়ূনের সমাধি-মন্দির।)

আবার তৃতীয় দিবস আহারান্তে আমরা প্রথমেই সম্রাট হুমায়ূনের বিখ্যাত সমাধি স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। এই পবিত্র শুভ্র সমাধি-মন্দির প্রণ-

য়িনী ভার্য্যার প্রাণপতি-বিয়োগ-শোকের অমূল্য স্মৃতি চিহ্ন। পঞ্চদশ লক্ষ মুদ্রায় এবং ষোড়শ বর্ষ ব্যাপী পরিশ্রম-নির্ম্মিত এই সমাধি হর্ম্ম্য* মৃত স্বামীর স্মরণার্থ হামিদাবানু বেগম কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। সেই সুন্দরী ললনার বৈধব্য-কাতর শোকাশ্রু সুদীর্ঘ নিশ্বাস সহ যেন অদ্যাপি ইহার বর্ষীয়ান অঙ্গের চারু শোভা সম্পাদন করিতেছে। কত যুগান্তের কঠোর বিস্মৃতি তাহার লাবণ্যের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে, তথাপি সতীর পবিত্র নেত্রবারি মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই। বাদসাহ হুমায়ূন যেরূপ দুর্দ্দান্ত ছিলেন, তাঁহার সমাধি-অট্টালিকাও তদ্রূপ। নিরেট খিলানময় সুদূর বিস্তৃত দীর্ঘ কলেবরে ঐতিহাসিক যুগের প্রকাণ্ড পাষাণ মন্দির 'মাকবারা' আজিও অভগ্ন এবং সকলের প্রিয় দর্শন। আভ্যন্তরিক প্রাচীরের ললিত কারুকার্য্যের রমণীয়তা এখনও কিছুমাত্র নষ্ট হয় নাই। তবে

---

* The Mausoleum was erected at the cost of fifteen lacs of rupees, in sixteen years, from 1554 to 1570."
Travels of a Hindoo.

শূন্যতার আঁধারে কপোত কপোতী সুখে নীড় বাঁধিয়া শাবক-কূজনে তাহাকে যেন বিহঙ্গমাশ্রম করিয়া তুলিয়াছে এবং রাজ-পথের অনিবার্য্য ধূলিকণায় তাহার বাহিরের সৌন্দর্য্য আর এক অভিনব কৃত্রিম বর্ণ ধারণ করিয়াছে।

হুমায়ূন বঙ্গমাতার নিকটও অপরিচিত নহেন। তাঁহারা অদ্যাপি প্রতি নিশায় দুরন্ত বালক বালিকাকে নিদ্রিত করিতে যে 'হুমো এলো' বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিয়া থাকেন, সেই 'হুমোই' হুমায়ূন নামের অপভ্রংশ এবং তাঁহার সমাধি মোগল প্রাসাদের আদি-কীর্ত্তি।

বেগম ললাম হামিদাও প্রাণেশ্বরের সমাধি শয্যার বাম প্রকোষ্ঠে চির-নিদ্রিতা আছেন। তিনি ব্রাহ্মণ কন্যার ন্যায় বৈধব্য-জীবন ব্রতাচারে কাটাইয়া অন্তিমে স্বামীর পার্শ্বে শান্তি লাভ করিয়াছেন। লাবণ্য-গঠিত 'তাজমহল' যেমন পতিপ্রেমে, এই 'হুমায়ূমাক্‌বারা' ও সেইরূপ পত্নীপ্রেমে উৎসর্গীকৃত অমানুসিক জয়-স্তম্ভ।

'হুমায়ূমাকবারার' অনতিদূরে অসংখ্য বেগম, সাজাদা, সাজাদি (রাজকুমার, কুমারী) ও অন্যান্য রাজ-পরিবার-শোকের অন্ধকার ছায়া স্বরূপ যত্ন-প্রথিত সমাধিতলে শায়িত রহিয়াছেন। সেই সকল শিল্প-ময় সমাধিমঞ্চ কালের ভীষণ বজ্রাঘাতে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু সে শ্মশান-মৃত্তিকায় শোক-চিহ্ন এখনও জীবন্তভাবে মূর্ত্তিমান। অসংখ্য পুত্র-শোকাতুরা মাতার, পতি-বিয়োগ-বিধুরা কামিনীর এবং স্নেহময়ী সহোদরার শোকাশ্রু-প্লাবিত ভগ্ন পাষাণস্তূপ নিরী-ক্ষণ করিয়া শোকার্দ্র হৃদয় স্বতঃই দ্রবীভূত হইয়া যায় ও অনেকের পক্ষে অশ্রুনীর নিবারণ করা কঠিন হইয়া উঠে।

পূর্ব্ব-সৌভাগ্যের দিনে এ সকল ভগ্ন সমাধি নিশীথে দীপালোকে ও দিবসে রাজদত্ত পুষ্প-হারে সুসজ্জিত হইয়া মৃতের গৌরব রক্ষা করিত। এখন তাহা শৃগাল কুক্কুরের আবাস স্থান হইয়া উঠিয়াছে এবং ফুলমালার পরিবর্ত্তে নানাবিধ আরণ্য পাদপ নিচয়ে তাহাকে ছায়াময় করিয়াছে। কোন কোন

সমাধির স্বর্ণাক্ষর বিলুপ্ত-প্রায়, কাহার বা এখনও দু, চারি অক্ষর পড়িতে পারা যায়। আরব্য, পারস্য ভাষায় লিখিত গুণাবলীর অর্থ আমরা মৌলবীর সাহায্যে কতক বুঝিলাম। একটী সপ্তদশ-বর্ষীয়া বালিকার অলৌকিক প্রতিভাময় দেবত্ব-কাহিনী, তাঁহার জনকের শোকাভিভূত হৃদয়ের স্নেহপূত পবিত্র ভাষায় সংস্কৃতে রচিত, পড়িয়া চক্ষে জল আসিয়াছিল। সে গদ্য কাব্য যেন অপূর্ব্ব ছন্দময়ী কবিতার স্বর্গীয় সৌরভে ছায়া পথে তারকাবৎ ফুটিয়া রহিয়াছে। ছায়া পথ আলোকিত করিয়া সে নাক্ষত্রিক প্রতিভা আজিও দর্শক প্রাণে রশ্মিকণা প্রতিভাত করিতেছে। তাহা অনন্ত, অমর, অবিনশ্বর, দীপ্তিপূর্ণ।

শ্মশান।

সেই রাজকীয় অর্দ্ধ ভগ্ন শ্মশান প্রাঙ্গণ ছাড়িয়া ইতস্ততঃ ঘুরিতে ঘুরিতে আমরা আর এক ভীষণতম শ্মশানে আসিয়া পড়িলাম। পথ ভুলিয়া হটাৎ যে

এখানে আসিয়াছিলাম এমন নহে, “অনঙ্গপাল দীঘী” দেখিতে এ প্রেতভূমি অপরিহার্য্য। এক শ্মশান পরিহার করিয়া অন্য শ্মশানে আসিলে মনে যে কোন রূপ নূতন শোকানুভব হয় না তাহা কে বলিবে? মৃত্যু ছায়া প্রতিবারই ঘনীভূত অন্ধকারময় ও সমভাবে সহানুভূতি পাইবার যোগ্য। যাহারা গিয়াছে তাহারাত পরিজনের হৃদয়ের শান্তি—জীবনের সুখাশা এবং চিরকালের আনন্দ লইয়া স্মৃতির পরতে পরতে শোকাগ্নি জ্বালাইয়া অনন্তে মিশাইয়াছে। তাহাদের বিনিময়ে হাহাকার, অশ্রুবারি এবং অবিরাম দীর্ঘশ্বাস রাখিয়া গিয়াছে মাত্র। মৃত্যুময় শ্মশান ক্ষেত্র, ভবনদীর তীর, অন্তিমের বেলাভূমি নিত্যই শোকাচ্ছন্ন।

এখানে অগণ্য সমাধি স্তূপাকার ভগ্ন প্রস্তর খণ্ডে কেমন ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছে। ভূত প্রেত পিশাচ যেন দিবসেই ইহার চারিদিকে বিকট হাস্যে নৃত্য করিয়া বেড়ায়। জন প্রাণীর সাক্ষাৎ নাই কেবল—

"পোড়া হাড় ছড়া ছড়ি
মরা নিয়া কাড়া কাড়ি
করিতেছে শ্যালের বিতান"

এই ধ্বংস প্রায় শ্মশানে সংখ্যাতীত অগণ্য মৃত শব চির সমাধিতলে ধূলি শয্যায় শয়ন করিয়াও কালের নিষ্ঠুর হস্তের উৎপীড়ন হইতে শান্তিলাভ করিতে পারে নাই। সময়ের নির্ম্মম অত্যাচার তাহাদিগের বিরাম সমাধি ভঙ্গ করিয়া চলিয়া গিয়াছে! পরবর্ত্তী জীবের নিকট পরিচয় দিবার কোনই চিহ্ন রাখিয়া যায় নাই। কি জানি কেন এ ভয়ঙ্কর শ্মশান প্রাঙ্গণে পড়িয়া আমার হৃদয়ের অন্তঃস্তল পর্য্যন্ত কাঁপিয়া গেল, স্তম্ভিত হইয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলাম, আত্মহারা আমি একপদ অগ্রসর হইতে পারিলাম না। চক্ষের সম্মুখে মৃত্যুর শরীরী করাল ছায়া ভীষণ হইতে ভীষণতর আকৃতিতে যেন ছুটাছুটি করিতে লাগিল। সে অপ্রত্যাশিত ভয়াল দৃশ্যে শৈশব-সুখ-স্মৃতি যৌবনের আশালোক ও আজিকার কল্পনাময় প্রতীক্ষায় ভাবী কাল কোথায় যে আঁধারে

ডুবিয়া গেল তাহা বলিতে পারি না। কেবল অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ জুড়িয়া ভীমরূপী শ্মশান সৈকত, জীবনের পরিণাম, ও মনুষ্যের শেষ দিন আসিয়া দেখা দিল। সে জীবন আজ আছে, কাল এই শ্মশান মৃত্তিকায় জ্বলন্ত চিতানলে নির্ব্বাপিত হইবে তাহা লইয়া এত অহঙ্কার এত গর্ব্ব ও এত বাড়াবাড়ি কি ভাল ? বহুদিনের কথা, ঘটনাবশতঃ একবার ভারত স্বাধীনতার শেষ লীলাভূমি পলাসী প্রান্তর দেখিতে গিয়াছিলাম তখন মহামারি ম্যালেরিয়া জ্বরে রাঢ় অঞ্চল উৎসন্ন যাওয়াতে অসংখ্য জীর্ণ শীর্ণ পীড়িত ব্যক্তি আত্মীয় স্বজনের মৃত শরীর পাষাণে বুক বাঁধিয়া ভাগীরথীর তীরে তীরে সৎকার করিতেছিল এবং জাহ্নবীর তটভূমি শবদাহের জ্বলন্ত চিতাধূমেও বিয়োগ বিধুরা মাতা কন্যা এবং পত্নীর হাহাকার ক্রন্দন রোলে এমন ভয়ানক হইয়াছিল যে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কালে সেই হু হু শব্দ গর্জ্জিত শ্মশান জীবনের চারিদিকে দেখিয়া দেখিয়া কিশোর হৃদয় যেরূপ কাতর ও অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল তাহারই সঙ্গে এ

ছিন্ন ভিন্ন অনার্য্য সমাধি প্রাঙ্গণের সাদৃশ্য দর্শনে কেমন অবাক হইয়া গেলাম, শোক দুঃখের স্মৃতি কখনও একেবারে মুছিয়া যায় না—সেইত দুঃখ। পরলোক বিশ্বাসী ধার্ম্মিক হিন্দুর নিকট শ্মশানে সৈকত যতই সুখমার্গ হউক না কেন, তাহার প্রত্যক্ষ সংশ্রব শান্তিপ্রদ নহে। যদিও

"চিরদিন বিহরিতে ইহ মর্ত্তলোকে
চাহি না আমরা, যবে প্রাচীন দশায়
দেহবাস ত্যজে প্রাণ, কে দোষেরে তোকে,
জরাজীর্ণ স্থবিরের তুইরে সহায়।
ইন্দ্রিয় আয়ত্ত নয় শরীর বিকল,
অশীতি পরের বটে মরণ মঙ্গল"

'বাউলি।'

অনঙ্গপাল দীঘি।

রাজা দ্বিতীয় অনঙ্গপালকৃত "বাউলি" লম্বায় ১৬৯ ফিট এবং ১৫২ ফিট গভীর ও দেখিতে এক প্রকাণ্ড

ব্যাপার। চতুর্দ্দিকে ভগ্ন অট্টালিকা ও পরিত্যক্ত ভূমি তাহার মধ্যস্থলে এই সুবৃহৎ জলাশয় অদ্যাপি পূর্ণ সলিলে নিদাঘ নবজলধর শোভায় টল মল করিতেছে। মধ্যাহ্নে তাহার বাঁধা ঘাটে—স্নানার্থ যাত্রীগণে এত জনতা হয় যে তাহাকে "যোগের গঙ্গা স্নান" মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে। শুনিলাম দিল্লীর দূর পল্লীস্থ অসংখ্য নর নারী এই উপাদেয় শীতল জল পানে আজিও জীবন ধারণ করে এবং নিত্য নিয়মিত রূপে এখানেই তাহারা অবগাহন করিতে আইসে, ইহার বারি এমন কাচবৎ স্বচ্ছ দুয়ানি কি সিকি ভিতরে নিক্ষেপ করিলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালক বালিকাগণ অনায়াসে নিমগ্ন হইয়া তাহা উত্তোলন করে। আমাদেরও গাইড মহাশয়—এ কৌতুক দেখাইবার জন্য কয়েক জন শিশু জুটাইয়াছিলেন কিন্তু সুকুমারমতি বালকদিগের প্রাণের বিপদাশঙ্কায় আমি সে ক্রীড়া দর্শনে স্বীকৃত হই নাই। মহম্মদঘোরী দ্বিতীয় অনঙ্গপাল পুত্র তৃতীয় অনঙ্গপালের সময় দিল্লী অধিকার করিলে রাজ পরিবার "লালকোট" দুর্গে আশ্রয়

গ্রহণ করে এখনও সেস্থান "কেল্লারায় পৃথ্বিরাজ" নামে পরিচিত।

'আজবঘর।'

"মিউজিয়াম।"

শ্মশান স্মৃতির তামসী নিশা কুস্বপ্নে অতিবাহিত করিয়া আবার আশাময় নবোদিত সূর্য্য রশ্মির লাবণ্য-ছটায় "ভ্রমণ" কাব্যের চতুর্থ দিন সমাগমেই আমরা "আজবঘর" দেখিতে গেলাম।

ভারতেশ্বরীর প্রমোদ উদ্যানে (Queen's Gardens) লতা পুষ্পতরু রাজি পরিবেষ্টিত এই সুরম্য প্রাসাদ "আজবঘর" তৎকালে অবরুদ্ধ থাকায় আমরা তাহার দ্বার উদ্ঘাটন পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা না করিয়া কেবল মাত্র বাহ্য শোভা সন্দর্শনে পরিতৃপ্ত মানসে বাসায় প্রত্যা-বর্ত্তন করি বাদসাহদিগের পূর্ব্ব সম্পদের নিদর্শন স্বরূপ মণিময় কারুকার্য্যের বলয়, শিরস্ত্রাণ এবং জরির

বিনামা ও বেগামগণের নত "হয়কল" "বাজুবন্দ" ও অঙ্গুরীয় প্রভৃতি দিল্লীর—"মিউজিয়ামে" দর্শনীয়রূপে রক্ষিত আছে নাকি, শুনিলাম।

'কুতবমিনার।'

চিত্রময়ী মায়ানগরী দিল্লী মহাকাব্য স্বরূপ, সংক্ষিপ্ত জীবনের গণনীয় দিবসে তাহা পাঠ সমাপ্ত করা বড় আয়াস সাধ্য কার্য্য। একাব্যের "পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে" যে দীপ্তিমান অপ্রতিম মাধুরী তাহা ভাষায় প্রকাশিত হয় না, কারণ বিষয় মহৎ ভাষা দরিদ্র স্থতরাং কি আর বলিব? দিল্লীর যাহা কিছু দর্শনীয় সবইত দেখিলাম কিন্তু ভগ্ন স্বাস্থ্য নিবন্ধন জগত বিখ্যাত "কুতবমিনার" দর্শন সুখে বঞ্চিত আমি দূর—হইতে কেবল তাহার রমনীয় দৃশ্যে নয়ন তৃপ্ত করি, নীলাম্বরস্পর্শী উচ্চতম প্রাসাদ শির হইতে তাহাকে অস্তগামী ভানুকরে নিরীক্ষণ করিয়া হৃদয়ে

যে অলৌকিক ভাবোদয় হইয়াছিল এখন যেন তাহা কেমন অস্পষ্ট ছায়াময় সুখ স্বপ্নবৎ বোধ হয়। দূরতা প্রযুক্ত বাস্তবিকতাও অদ্য নিস্ফল স্বপ্ন হইয়া গিয়াছে।

"কুতবমিনার" সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য তাহা ৫ই ফাল্গুনের "সুরভি পতাকা" হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"কুতবমিনার শিল্প জগতে অদ্বিতীয় বিজয়স্তম্ভ। ইহা অধুনা ২৩৮ ফিট উচ্চ, কথিত আছে এক কালে ইহার উচ্চতা ৩০০ ফিট ছিল, কিন্তু তৎসম্বন্ধে কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না, ১৭৯৮ খৃঃঅব্দে মিনার ২৫০ ফিট ১১ ইঞ্চ উচ্চ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়া ছিল। জগতের নানাদেশে নানাবিধ অত্যুচ্চ স্তম্ভের কথা শুনিতে পাওয়া যায়, এলেকজন্দ্রিয়া নগরে পম্পেরস্তম্ভ; কেরোনগরে হুষণের মসজিদ; রুষ-রাজধানী সেণ্টপিটসবর্গে এলেকজন্দ্রিয়ান বিজয়-স্তম্ভ—এই সমস্ত স্তম্ভের কথা পাঠক ইতিহাসে পাঠ করিয়াছেন; কিন্তু দিল্লীর কুতব মিনারের সহিত তুল-

নায় ঐ সমস্ত অসামান্য স্তম্ভও অতি সামান্য বলিয়া বোধ হয়।

মিনারের তলদেশ একটী বিশাল বহুভুজ; ইহাতে সর্ব্বসমতে ২৪টী ভুজ। সেগুলি সর্ব্বসমেত ১৪৭ ফিট বিস্তৃত। ভুজ সমূহের শিরোদেশে স্তম্ভ উন্নত, তাহা ক্রমে সূক্ষ্মাগ্র হইয়া অনন্ত নভোমণ্ডলে উত্থিত হইয়াছে; যে দিন যে মহাত্মা এই অদ্ভুত স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন সেই দিন অনন্ত কাল সাগরে কবে বিলীন হইয়াছে; কিন্তু কুতবমিনার মানব গৌরবের অবিনশ্বর নিদর্শনরূপে সুদীর্ঘ কালের জন্য উদ্যত রহিয়াছে, রাজার পর রাজা পৃথ্বীরাজের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ভারতের অদৃষ্ট চক্র পরিচালনা করিয়াছেন, আবার অখণ্ডনীয় বিধিলিপির অনুসারে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া অনন্ত কাল সাগরে ডুবিয়া গিয়াছেন; আফগান, পাঠান, তাতারীয়, মোগল, দুরাণী কোথায়? অতীত সাক্ষী ইতিহাসের প্রতিপত্রে তাহাদের অতীত গৌরব কাহিনী দেখিতে পাওয়া যায়; দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া

তাহারা সকলেই এই বিরাট স্তম্ভের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক আত্মজীবনের অকিঞ্চিৎকরত্ব ভাবিয়া একদিন না একদিন দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছে ?

কুতবমিনার পাঁচটী তলে বিভক্ত ; এক একটী তল এক একটী পাথরের বারাণ্ডা দ্বারা বেষ্টিত। তৃতীয়তল পর্য্যন্ত ইহা সুন্দর আরক্ত প্রস্তরে গঠিত ; তদূর্দ্ধ ভাগ ধবল মর্ম্মর নির্ম্মিত। দূর হইতে এই বিচিত্র স্তম্ভের শোভা অতীব মনোহর। ইহার চতুর্দ্দিকে অসংখ্য অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ ভূতলে বিলীন হই-বার উপক্রম করিতেছে। মসজিদের পর প্রাসাদ, প্রাসাদের পর অট্টালিকা, তাহার পর প্রকার কালের কঠোর লৌহদণ্ড প্রহারে চর্ণিত হইয়া যেন ইহার চরণতল চুম্বন করিতেছে ? দূরে সূর্য্যতনয়া কালিন্দী ভারতের শোক সঙ্গীত গাইতে গাইতে প্রবহমান হইয়াছে।

কথিত আছে কোন হিন্দু নরপতি স্বীয় দুহিতার যমুনা দর্শনের নিমিত্ত এই প্রকাণ্ড অট্টালিকা স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু এ কথা কতদূর সত্য তাহা

ঠিক করিয়া বলিতে পারা যায় না। কুতব মিনারের স্থাপনকর্ত্তাকে এবং কোন শিল্পই বা ইহা নির্ম্মাণ করিয়া যান; অদ্যাপি তৎসম্বন্ধে মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্তম্ভের চতুর্থতলের দ্বার দেশে খোদিত আছে শ্রীবিশ্বকর্ম্মপ্রসাদাৎ চাহণ্ডদেব পালস্য পুত্রেণ শ্রীমন্নান পালেন রচিত"। নানপাল এই অদ্বিতীয় অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া শিল্প জগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। কুতব মিনার যতদিন জগতের সমস্ত অট্টালিকা ও স্তম্ভের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষা করিবে ততদিন প্রত্যেক ভারতবাসী ভক্তিকুসুমাঞ্জলির দ্বারা স্থপতি বিদ্যা বিশারদ নানপালের স্মৃতি চিহ্ন পূজা করিবে। ভারতীয় পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মধ্যে কুতবমিনার স্বম্বন্ধে দুইটী মত দেখিতে পাওয়া যায়। এক দল বলেন ইহা হিন্দু নৃপতি দ্বারা স্থাপিত; অপর দল মুসলমানকে ইহার স্থাপয়িতা রূপে সপ্রমান করিতে চেষ্টা করেন।" (সুরভি পতাকা)

স্বদেশাভিমুখে।

অতীত সৌভাগ্যের স্মৃতিরূপী প্রাসাদময় দিল্লী ও আর্য্য বীরত্বের পবিত্র শেষ রেখা ইন্দ্রপ্রস্থ পরিহার করিতে মন যে দ্রবীভূত হয় নাই এমন নহে তবুও যেন এই পরিত্যক্ত সুরপুরী দর্শনে অমিশ্রিত আনন্দ উপভোগ অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে নাই। তাহার প্রত্যেক শিলাখণ্ডে ধূলি কণায় ঐতিহাসিক যুগের গৌরবচিহ্ন জাগ্রত দেখিয়া, হৃদয় কেমন ব্যথিত হইয়া যাইত। হতভাগ্য মনুষ্য সুখাপেক্ষা শান্তির ভিখারী, তাই এ মহা নগরী ছাড়িতে এত অধীরতা হইয়াছিল। নির্দিষ্ট প্রভাতেই আমরা তাহার নিকট বিদায়—হয়ত চির দিনের তরেই বিদায় গ্রহণ করিলাম। কিন্তু অনিশ্চিত জীবনের ভবিষ্যৎ অজ্ঞাত অন্ধকারে নিহিত থাকায় অপ্রসন্না ভাগ্যদেবী আবার কবে যে কোথায় লইয়া ফেলিবেন তাহা অদ্য কেমন করিয়া বলিব?

"হায় সেইত সকল,
পূর্ব্ব গৌরবের স্থল,

এইত ভারতভূমি প্রিয় নিকেতন ;
এই সেই পুণ্যস্থান শোভার সদন !
কেনরে আঁধারময়,
কেন অচেতন প্রায়,
নাহি কেন রবিকর ভারত আগারে ?
নির্জ্জীব ভারত কাঁদে দর দর ধারে।
"সেই বাট সেই মাঠ,
সেই সরোবর ঘাট,
সেই সমুদায় আজ করি দরশন,
তবে কেন দেখি সব বিষাদে মগন।
সেই রবি সেই শশী,
সেই দিবা সেই নিশি,
সকলি নিয়ম মত চলেছে তেমন
কেন আর্য্যসুত সব মোহে অচেতন !"
"বহিতেছে সমীরণ,
ফুটিছে কুসুমগণ,
হাসিছে তারকা ওই সুনীল অম্বরে,
গাইছে বিহগকুল মোহিত অন্তরে।
চলিতেছে ভাগীরথী,
বহিছে যমুনা সতী,

মৃদু মৃদু কল কলে নিনাদ করিয়া,
উন্মাদিনী দুই বোন যৌবনে মাতিয়া।
"হিমালয় বিন্ধ্যগিরি,
মস্তক উন্নত করি—
গগন পরশি গর্ব্বে আছে দাঁড়াইয়া
ভারত গৌরব কেন গেলরে নিবিয়া।
আসিছে বসন্ত কাল
বিস্তারি রূপের জাল,—
সকলিত রহিয়াছে পূর্ব্বের মতন,—
শরতের শশী আসি হাসায় ভুবন।
"তবে কেন নিদ্রাগত
ভারত বাসীরা যত,
জাগে নাকি পূর্ব্ব কথা কাহারো অন্তরে,
না ছিঁড়িবে মোহপাশ জাগিয়া অচিরে।
জ্ঞানমান বীর্য্য বল
কোথায় সকল বল,
পিতা পিতামহ কীর্ত্তি ভুলিলে কেমনে,
কলঙ্ক কালিমা কেন ঢালিলে জীবনে,
"নাহি শাস্ত্র আলোচন,
নাহি ষড়-দরশন,

অনন্ত কালের গ্রাসে গিয়াছে সকল,
ভগ্নপ্রায় রহিয়াছে গৌরব কেবল।
অযোধ্যা হস্তিনা পুরি,
ভগ্নশিলা সারি সারি
রহিয়াছে পড়ে আজ শোক নিদর্শন
হায়! মানবের কীর্ত্তি নশ্বর এমন!
"চাহিনা দেখিতে আর
সেই সব শোকাধার,
আজি যাহা দেখিতেছি ভারত ভবনে,
দেখিলে শোকের শেল বাজে এ জীবনে।
ভঙ্গ হোক কীর্ত্তিচয়
একেবারে হোক ক্ষয়,
এক বিন্দু অশ্রু নাহি ঝরিবে কখন
স্মৃতিসহ সমুদায় দিব বিসর্জ্জন।
"ভুলে যাই সমুদায়
নিষ্ফল স্বপন প্রায়,
গভীর তরঙ্গ তুলি তুমি ভাগীরথি!
ভারতের হতকীর্ত্তি নাশ, স্রোতস্বতি,
সহে না এ সব জ্বালা;—
এই ভগ্ন কীর্ত্তি মালা,

জাগাইতে পূর্ব্ব স্মৃতি বিষাদ ভাণ্ডার,
ভারত হৃদয়ে যেন থাকে না গো আর।
এই সব নিরখিয়া
ফাটিয়া যাইছে হিয়া,
তাই বলি সমুদায় হোক ভস্মময়,
পুড়িয়া ভারতকীর্ত্তি হোক শীঘ্র ক্ষয়,
ওহে রবি শশী তারা,
তিমির নাশক যারা,
ভারতে আসিয়া কর করোনা বর্ষণ,
গভীর তিমির জালে লুকাও কিরণ।
হতবীর্য্য, হতবল,
নির্জ্জীব পতঙ্গ দল
কাঁদিছে ভারত মাতা বক্ষেতে লইয়া,
শত স্রোতে অশ্রুধারা যাইছে বহিয়া,
সহেনা, সহেনা আর,
বিষাদের চিরাধারে,
দেখিব না চক্ষু মেলি কীর্ত্তি নিদর্শন
কালি যেন সকলই হয়রে স্বপন।”

(সমাপ্ত।)

নীহারিকার।

(তত্ত্ববোধিনী হইতে উদ্ধৃত)

ধর্ম্মরূপ কাব্য।

("নীহারিকার" "জীবন্তকাব্য" অবলম্বন করিয়া লিখিত)

যখন তরুণ অরুণের তরল কাঞ্চন কিরণ জাল অচল স্থির হিমাদ্রির তুষার মণ্ডিত শিরোদেশের উপরি বর্ষিত হইয়া তাহা আশ্চর্য্য শোভায় শোভন করে তখন হিল্লোলে হিল্লোলে বিকম্পিত তাহার অনন্ত সৌন্দর্য্যময় নয়ন-রঞ্জন স্ুবর্ণ বিভার কবিত্ব দেখিয়াছি। কিন্তু ধর্ম্মরূপ পরম কাব্যে প্রদর্শিত যে কবিত্ব সে কবিত্ব আর কোনখানে দেখি নাই। বসন্তে প্রাণ ভরিয়া বিহঙ্গমের মধুর গান শুনিয়াছি, কানন মাঝারে ললিত শিশিরসিক্ত কুসুম-নিচয়ের হৃদয়মোহনকারী শোভা দেখিয়াছি, সরসী-স্থিত মৃদুল—মৃদুল-বায়ু চুম্বিত ফুল্ল সরোজিনীর হেলুনি তুলনি ও লহরে লহরে হাস্য দেখিয়াছি। সায়াহ্নে যখন গৌরব মণ্ডিত ছবি রক্তিম রবি নিজ শিথিল জীবন নীলাম্বু শয্যায় ঢালিয়া বিশ্রাম জন্য অলস আঁখি মুদ্রিত করে তখনকার আকাশের প্রকৃতির মনোলোভা গাম্ভীর্য্য জড়িত শোভা কতবার স্থিরনেত্রে দর্শন করিয়াছি কিন্তু ধর্ম্মরূপ কাব্যে যে সৌন্দর্য্য আছে তাহা কোথায় দেখি নাই! শরৎকালে পূর্ণিমা রজনীতে যখন

পূর্ণ শশধর গগন-ভালে উদিত হইয়া মর্ত্তলোক ও দ্যুলোক কৌমুদী তরঙ্গে বিভাসিত করে তখন সেই চঞ্চল চন্দ্রমাকরে গম্ভীর সিন্ধুর উচ্ছ্বাস ও কুমুদিনীর হাসা সম্মুখস্থ দৃশ্যে কতবার প্রাণ ভাসাইয়া দেখিয়াছি, কতবার ধরাতলে বসিয়া অন্ধকারের সঙ্গে মিশিয়া তারকাখচিত অন্ধকার রজনীতে গগনের গাত্রে সহস্র সহস্র হীরক-খণ্ডের বিবিধ সৌন্দর্য্যরাশি আনন্দ সাগরে ভাসিয়া দেখিয়াছি কিন্তু ধর্ম্মরূপ পরম কাব্যে প্রদর্শিত যে রূপ শোভা জীবনে কখন দেখি নাই। বর্ষার আগমনে যখন পূর্ণ তরঙ্গিণীগণ সৌন্দর্য্য উচ্ছ্বাসে উথলিয়া পড়ে তখন মুগ্ধ প্রাণে সকল ভুলিয়া সে শোভা দেখিয়াছি কিন্তু ধর্ম্মরূপ কাব্যের একাধারে যেরূপ অপ্রতিম অপার্থিব শোভা রহিয়াছে এমন শোভা কখন দেখি নাই। ভূলোকে ত্রিদিবের হাস্য-স্বরূপ অনন্ত সৌন্দর্য্য রাশি এই পরম কাব্যের পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে কি শোভা ধারণ করিয়া মধুর ভাবে দীপ্তি পাইতেছে! নিত্য বসন্তের বায়ু. সঙ্গীতের চিরোচ্ছ্বাস, শত শারদীয় শশীর গৌরব কিরণ অবিরাম এই কাব্যে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই কাব্য হৃদয় বিমুগ্ধ করিয়া মধুর সঙ্গীত স্বরে দিবারাত্রি প্রাণের উপর উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসে সুধা ঢালিতেছে। এই কাব্য দেখিয়া হৃদয় সুখেতে নৃত্য করিতেছে। কতবার নীরব হইয়া নির্জ্জনে বসিয়া ভাবি আহা! সংসার ভবনে এত শোভা কে আনয়ন করিল। বালকের সুধাময় হাস্য, বিজয়ীর জয়োচ্ছ্বাস দীর্ঘ বিরহের পর মিলনও প্রাণে প্রাণে

শতবার সুখময় অলিঙ্গন, সুদীর্ঘ নিশাবসানে সুখ-স্বপ্নের বশে বিলোকিত প্রবাসী পুত্রের মুখমণ্ডল দর্শন অতি মধুর কিন্তু এ কাব্য তদপেক্ষাও মধুর। প্রণয়াস্পদের প্রতি দৃষ্টিতে স্বর্গীয় সুধার বৃষ্টি হইতে থাকে এবং তরলিত মাদকতা জীবনে বর্ষিত হইয়া থাকে, নয়নের নীরব ভাষা দ্বারা কত প্রেম কত আশা প্রকাশিত হয়, এরূপ ভালবাসার অনন্ত সঙ্গীত এই কাব্যে নিহিত রহিয়াছে। যেমন এক বৃন্তে দুইটি ফুল অশেষ সৌরভে ফুটিয়া হৃদয় মোহনকারী পূর্ণ বিকশিত শোভা ধারণ করিয়া নয়ন বিমুগ্ধ করত দীপ্তি পায় তেমনি এই কাব্যে মধ্যাহ্ন-রবিকরের ন্যায় প্রখর জ্ঞান সুস্নিগ্ধ সুখকর চন্দ্ররশ্মির ন্যায় মনোরম প্রেমের সহিত মিলিয়া দুই চিত্র একচিত্রে অপূর্ব্ব পরিণতির ন্যায় হাস্য করিতেছে। কত বিজ্ঞান ও কবিত্ব, কত দর্শন ও সাহিত্য, কত শত শত ইতিহাস এই কাব্যের সঙ্গে অভেদে জড়িত রহিয়াছে—এবং অঙ্কে অঙ্কে বর্ণে বর্ণে মধুররূপে চিত্রিত রহিয়াছে। কতবার প্রীতিভরে এ কনক কাব্য দেখিয়া আমার মন নয়ন মুদ্রিত করিয়া হৃদয়ে তাহার প্রণেতাকে দেখিয়াছে। আকাশ ধরণীতল সকল স্থল এই কাব্যময় দেখি। চক্ষু সুখে প্রসারণ করিয়া দেখি চারিদিক এই কাব্যে অনুক্ষণ ভাসিতেছে। ভক্তি, প্রেম ও সরলতা সুখে সম্মিলিত হইয়া সৌন্দর্য্যনির্ঝর দ্বারা নিত্য শোভা বর্ষণ করিয়া এই কাব্যকে আলোকিত করিয়াছে! এই কাব্য অশরীরী ও সকলই মানসময়, অতি মনো-

হয়। এই কাব্য যত পাঠ করি ততই অন্তর অতৃপ্ত থাকে। সুখে এই কাব্য পাঠ করিয়া কবিত্ব-তরঙ্গে হৃদয় ভাসাইয়া নীরবে পঠিত বিষয় স্মরণ করি ও সুখ-স্বপ্নের রাজ্যে বিচরণ করি। ত্রিদিব-সঙ্গীত দ্বারা হৃদয় শীতল করিয়া এই কাব্যের প্রাণের নিশ্বাস অনিবার সুধাসিক্ত নন্দন-সৌরভ আমার প্রাণে ঢালিতেছে। দিবসের কোলা-হলে অথবা বিশ্রাম সময়ে এই কাব্য চিন্তা করিয়া সমান আনন্দ পাইয়া থাকি। শোণিতে শোণিতে যেন তাহা অনুক্ষণ বহিতেছে। সতত আমি কাব্য দেখিতে পাই। তাহাতে দূরতাও নৈকট্য নাই। এ কাব্য আমি জীবন ভরিয়া পাঠ করিব এই জগৎকে ভুলিয়া ইহা সদা ভাবিব। নূতন নূতন তান শিখিয়া এই কাব্যের গান গাইব।

সে সময় প্রতিধ্বনি বিভোর অন্তরে কাব্যের যত মাধুরী অম্বরে বিস্তৃত করিবে। তারকাগণ জাগিয়া অনেক নেত্র খুলিয়া একত্র মিলিত হইয়া এই কাব্যের শোভা দেখিবে এবং মৃদুল হাসিয়া আঁখি আবার মুদ্রিত করিবে। এই কাব্য আমাকে শোক দুঃখ সহিতে ও মিথ্যাপবাদের তীব্রকণ্ঠ শ্রবণ করিয়া আমার শিথিল হৃদয়কে দৃঢ় করিতে শিখাইবে। যতদিন না অন্তিমের তীরে পৌঁছি ততদিন এই কাব্যের এই কাব্যের সাহায্যে নিজ অবস্থায় সদা সন্তুষ্ট ও সদা পুলকিত থাকিয়া এই সংসার-সাগরে জীবন-তরী বাহিয়া যাইব। আজীবন প্রীতিভরে এই কাব্য, অকাতরে পাঠ করিয়া মোহিত হইয়া এই ধরাধামে অবস্থান করিব এবং শান্তির ধারায় জীবন শীতল

করিব। জগতে আমার একমাত্র আশ্রয় এই নিরূপম কাব্য। তাহার জীবনে আমার জীবন, এমন জীবন্ত কাব্য কোথাও দেখি নাই।

শ্রদ্ধাস্পদ ধার্ম্মিক প্রবর শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় "নীহারিকা" পাঠ করিয়া সমালোচনা স্বরূপ এই পত্র লিখিয়াছেন।

অদ্য আপনার "নীহারিকা" সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। যদি গ্রন্থকর্ত্তার পূর্ব্বকার গ্রন্থ অপেক্ষা তাঁহার নবপ্রকাশিত গ্রন্থ নিকৃষ্ট হয় তাহা হইলে তাহাদিগের ক্ষোভের বিষয় হয় কিন্তু "নীহারিকা" সম্বন্ধে আপনার ক্ষুব্ধ হইবার কোন কারণ নাই। উহা "বনলতা" অপেক্ষা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট। আপনার ভাষার সরলতাও অনেক কোমল ভাব সকল বর্ণনে নৈপুন্য বিবেচনা করিলে আপনাকে Miss Southey (Miss Caroline Bowles) সঙ্গে তুলনা করিতে ইচ্ছা হয় কিন্তু আবার আপনার বীররস বর্ণনে নৈপুণ্য ও কোন কোন কবিতার তেজস্বিতা যখন বিবেচনা করা যায় তখন আপনাকে Joanna Ballie সঙ্গে তুলনা করিতে ইচ্ছা হয় কিন্তু সারণ্য ও মনের কোমলতা সকল বর্ণনে নৈপুন্যই আপনার প্রধান গুণ। উচ্চ অঙ্গের কবিতাতে বাঙ্গলা ভাষায় আপনার সমকক্ষ আছে কিন্তু "গাওরে আবার" "প্রিয় কুল" ও 'সাধের নলিনীতে" যে এক প্রকার বিশেষ কোমল ভাব প্রকাশিত হইয়াছে সে ভাব আপনারই, সে আর কাহারো নাই। এবিষয়ে আপনি অদ্বিতীয়।

সাধারণতঃ আপনার পুস্তকটি এইরূপ আলোচনা করিয়া তাহার

বিশেষ আলোচনায় এক্ষণে প্রবৃত্ত হইতেছি। আপনার পুস্তকের সকল কবিতাই মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছি। যদ্যপি নিম্ন-লিখিত সমালোচনাতে কোন কবিতার উল্লেখ না দেখেন তাহা হইলে মনে করিবেন যে তাহা বিশেষ উৎকৃষ্ট নহে। উৎসর্গটি অতি উৎকৃষ্ট। উহা দেবালয়ের পুষ্প চন্দনের ন্যায় পবিত্র ও গৌরবান্বিত। বসন্ত পঞ্চমীতে আপনার বিদ্যানিষ্ঠা ও কবিতা নিষ্ঠা বিলক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছে। আপনি আপনার নিজের অবস্থা বর্ণনা করিয়া সরস্বতীর নিকট যে বর প্রার্থনা করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে মন অতিশয় উদ্বেগ হইয়া উঠে। হিমানীপাতে আপনার অরণ্য কুসুমের নাশের যে আশঙ্কা এই কবিতাতে প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অমূলক।

"স্নেহোপহার""পবিত্র ভ্রাতৃ স্নেহ রসে পরিপ্লুত ও হৃদয়দ্রবকারী। ভ্রাতা ও ভগিনী মধ্যে যে প্রেম সে প্রেম অতি পবিত্র স্বর্গীয়। তুমি তাঁর চিরদিন শান্তির স্বপন" "প্রফুল্ল কুসুম তুমি সোদর উদ্যানে" "কোন্ স্নেহ ছায়াতলে বিরাম লভিব?" "স্নেহের নির্ঝর যেন হৃদয় তোমার" "অপার্থিব তব স্নেহ প্রতিদান নাই, কিবা দিব, কিবা আছে?" মৃত সঞ্জীবনী "শব্দ হইতে চঞ্চল সমীরে" পর্য্যন্ত এই সকল স্থল এই কবিতার সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থল। "যে আর্য্য বংশেতে প্রিয় জনম তোমার" "আর্য্যবংশ" না বলিয়া "বিপ্রবংশ" বলিলে ভাল হইত।

"চন্দ্রালোক" চন্দ্রালোকের ন্যায় রমণীয় কিন্তু বিষাদতা আপনার মনের এমনি স্বাভাবিক উপাদান যে এমন চন্দ্রালোকের উপর দিয়া বিষাদ মেঘ এমন ভাবে চলিয়া গিয়াছে যে ঐ চন্দ্রালোককে আরো রমনীয় করিয়াছে। "সেই চন্দ্রালোক" হইতে "দিবস শর্ব্বরী" পর্য্যন্ত অতি উৎকৃষ্ট অতি উৎকৃষ্ট।

উচ্চ অঙ্গের যত কবিতা এই পুস্তকে আছে তাহার মধ্যে "জীবন্ত কাব্য" সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। উহাতে স্থানে স্থানে যেরূপ ভাবের প্রগাঢ়তা ও সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে বাঙ্গালা ভাষায় অতি শ্রেষ্ঠ কবিরাও ঈর্ষান্বিত হইতে পারেন।

"স্মৃতি-রেখাতে" "গভীর গভীর তামসী নিশি" হইতে "দুঃখের শৃঙ্খল খসিয়া পড়িল" অবধি কয়েক পংক্তিতে ভাষায় অসাধারণ তেজস্বিতা প্রকাশিত হইয়াছে।

"মোহ স্বপ্ন" অতি সুন্দর।

"সব বর্ত্তমান" কবিতাতে আপনি ভূতকাল ও ভবিষৎকাল হইতে (From what you may be or have been before) আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া আপনাকে কেবল বর্ত্তমানে কি আশ্চর্য্যরূপ কেন্দ্রীভূত করিয়াছেন! "উজ্জ্বল প্রভাতভানু কিন্তু স্নিগ্ধকর" "প্রেমমুগ্ধা স্রোতস্বিনী হইতে আনন্দ উচ্ছ্বাস ভরে হইয়া মোহিত" পর্য্যন্ত কয়েক পংক্তি, "প্রত্যেক শোণিত বিন্দু কাঁপে ব্যগ্র মনে, কত চিন্তাকুলসম হইতে "রঞ্জে বার বার" পর্য্যন্ত কয়েক পংক্তি "সেই

মুখ নিরখিয়া” হইতে “জীবন সাগরে” পর্য্যন্ত চাহিনে আকাশ গায় হইতে “হৃদয়-গরিমা” পর্য্যন্ত, “শোভার মাধুরী” হইতে “ভাসিয়া বেড়ায়” পর্য্যন্ত এই কবিতার এই সকল স্থল সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। “প্রত্যেক শোণিত বিন্দু” কাঁপে ব্যগ্র মনে “এই পংক্তি পাঠ করিয়া আপনাকে “Sappho of Bengal” এই উপাধি দিতে ইচ্ছা হইল। ঐরূপ উৎকৃষ্ট পংক্তি সমস্ত পুস্তকে নাই।

“সাধ পুরিল না এই কবিতাতে * * কি “তন্ মন্ ধন্” অর্পণকারী প্রেম প্রকাশিত হইয়াছে! আহা! উহা কি সুন্দর! কি সুন্দর! তাহার স্থানে স্থানে হাফেজের ন্যায় প্রগাঢ়।

“উদাসীনের” প্রথম সঙ্গীতটি গেটের Religion in heaven কবিতা অনুকরণ কিন্তু অন্ধ অনুকরণ নহে।

“প্রিয় নিদর্শন” “দেব আশীষের” ন্যায় পাঠকের সুখদ ও মঙ্গলপ্রদ হইবে সন্দেহ নাই।

“আর্য্য নারী” প্রত্যেক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতেক ছাত্রীর কণ্ঠস্থ করিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

“গেল একটী বৎসর” বিষাদভাবে অত্যন্ত সংপৃক্ত। কি ভয়ানক চিত্র!

“অভাগিনী” নিতান্ত হৃদয়-বিদারিণী। এইরূপ করিয়া কি পাঠকের হৃদয়-বিদারণ করিতে হয়? দয়া রাখিবেন ইতি।

সাধুর পবিত্র অতৃপ্তি।

("নীহারিকার" "সাধ পূরিল না" অবলম্বনে লিখিত)

হে সৌন্দর্য্যের একমাত্র আধার পরমেশ্বর! বর্ষ বর্ষ ধরিয়া তোমার অরূপ রূপমাধুরী দেখিলাম তথাপি অন্তর অতৃপ্ত। আমার পিপাসা অনন্ত। অনুদিন তোমার নিরূপম শোভা পান করিয়া সাধ পূরিল না। যত দেখিনা কেন তথাপি হৃদয় অস্থির; আরো স্পষ্টরূপে আরো উজ্জ্বল রূপে দেখিতে ইচ্ছা করে। নব অনুরাগে তোমাকে সদা দেখিয়া দেখিয়া তোমার প্রেমানন আমার প্রাণের ভিতর নিরন্তর জাগিতেছে। আমার নয়নের সম্মুখে আনন্দভরে তোমার সুন্দর মুখ প্রকাশ পাইতেছে। যেইদিকে নেত্রপাত করি সেইদিকে তোমায় বদন দেখিতে পাই তথাপি আশা পূরিতেছে না। প্রতিদিন প্রিয় দর্শনে নূতন মনে প্রেমোচ্ছ্বাস ও ধমনীতে উষ্ণ শোণিতের প্রবাহ বহিতে থাকে। তব দর্শনে আমার চিত্ত বিহ্বল হইয়াছে; দিবস রজনী তোমার মূর্ত্তি আমার চিন্তার সঙ্গে মিশ্রিত রহিয়াছে। হে প্রিয়! তুমি বিশ্বময়। আমার চঞ্চল নেত্রদ্বয় কিবা নীলাম্বরে কিবা ধরাতলে চাহিয়া চাহিয়া থাকে এবং তোমাকে দৃষ্টির সীমায় রাখিতে চেষ্টা করে কিন্তু তুমি প্রতি পলকের সঙ্গে মিশাইয় যাও; আবার আবার তোমাকে অতৃপ্ত হইয়া দেখি। অরুণ কিরণে তোমার আনন্দ-জনক সুন্দর আনন সম্মুখে হাসিয়া ভাসিয়া যায়। প্রতি রশ্মি কণা-ভরে নূতন জ্যোতি ধরিয়া তুমি আমার নয়ন সম্মুখে প্রদীপ্ত হও। তোমাকে

আনন্দে ধরিতে যাই কিন্তু তুমি এই আছ, এই নাই! তুমি কোমল প্রেমছবি রূপে আমার হৃদয়ের অন্তরে আছ; তাহারই প্রতিচ্ছায়া জগতে ভাসিতেছে। নিশীথ সময়ে যখন সংসার নিস্তব্ধ ও নিদ্রিত তখন নীল আকাশের তলে নীরবে বসিয়া প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখি তখন যদি সুদূর হইতে দূর সমীর সঙ্গে সঙ্গীতের তান মধুরে মধুরে আসিয়া হাসিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করে তখন সেই সুধাস্বর শ্রবণ করিয়া চারিধার চাহিয়া থাকি, কারণ তুমি যে আমার অশরীরী সঙ্গীত আমাকে সেই সঙ্গীত স্মরণ করাইয়া দেয়। এবং অন্তর প্রীতির উচ্ছ্বাস-স্বপ্নে ঢালিয়া তোমার প্রিয় মুখ দেখি। হে জীবন-সম্বল! অবনী ও অম্বর সকলই তোমার বদনের ছায়া। তোমাতে চিত্ত মুগ্ধ অথচ তোমার আরো স্পষ্টতর দর্শন-লালসায় তাহা সতত চঞ্চল। গভীর নিশাতে নিদ্রার আবেশে যখন এ বিশ্বসংসার ভুলিয়া থাকি তখনও আমার মানস-সরোবরে তুমি প্রীতিজ্যোতিতে ভাসিতে থাক। আমি সুখের স্বপ্নে নিত্য তোমায় দেখিয়া জাগ্রত হইয়া আমার শূন্য গৃহের দিকে চাই। যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি সেই দিকে তুমি আঁধারের কিরণের ন্যায় দীপ্তি পাও; তোমার বদন কম্পিত প্রাণে দর্শন করি। যখন প্রবাসে চিত্রিত আকাশতলে প্রকৃতির চারুছবি সায়াহ্ন-রক্তিম সূর্য্য অস্ত যায় তখন নীরবে বসিয়া তুমি সান্ধ্য শোভার সঙ্গে মিশাইয়া রহিয়াছ এইরূপ ভাবি। তখন প্রকৃতিকে তুমিময় দেখি, তথাপি অন্তরে ক্ষণেকেরতরে তৃপ্তি হয়

না। এইরূপ তোমায় দেখিয়া অনন্ত বাসনা আমার চিত্তে রহিবে। তব দর্শনের কি মৃত সঞ্জীবনী শক্তি! জাহ্নবী সৈকতস্থিত শ্মশান-ভূমির ন্যায় যদি কোন আত্মা শ্মশানে পরিণত হয় কিন্তু তুমি যদি তাহার উপর দিয়া কভু চলিয়া যাও তাহা হইলে সেই শ্মশান ভূমির দগ্ধ পরমাণু সকল তোমার চরণস্পর্শে নবজীবন লাভ করিয়া আনন্দে কাঁপিতে থাকে এবং প্রতি পরমাণু কণা আবার তখন অধীর হইয়া তোমার চরণ চুম্বন করে।

নীলিমা সাগরে যখন অযুত তারকা মাঝে পূর্ণ শশধর দীপ্তি পায় এবং শ্রাবণের ধারামত যত রজত কৌমুদী নিশীথ সময়ে বসুধায় ঝরিয়া পড়ে তখন সৌন্দর্য্য বিমুগ্ধ প্রাণে সে শোভা পানে চাহিয়া শতবার তাহাতে তোমার বদন দেখি তথাপি সে দর্শনে চিত্ত কখনও স্থির হয় না। নিদাঘগগনে যখন সচল সৌদামিনী নবীন জলদের সঙ্গে নাচিতে থাকে এবং তাহার শোভাময় হাসির অতুল মাধুরী-রাশি দেখিয়া বিশ্ব চরাচর মুগ্ধ হয় তখন যখন চক্ষু শূন্যেতে তুলিয়া এবং সংসারের অস্তিত্ব ভুলিয়া আমিও অবনী অম্বর পুলকে চাহিয়া দেখি তখন দূরে ও অসীম শূন্যে তোমারই সুন্দর ছবি প্রকাশিত দেখি। নব পল্লবিতা কুসুম কোমলা বসন্ত-প্রকৃতির রাজত্ব সময়ে যখন সুরভি চুম্বিত বায়ু সৌরভ ঢালিয়া চলিয়া যায় এবং মোহময় পিককণ্ঠে সঙ্গীত উচ্ছ্বাস নির্গত হইতে থাকে এবং সেই চারু ললিততানে আনন্দ-প্রবাহ প্রাণে প্রবাহিত হইতে থাকে তখন

পুলকিত হইয়া বসন্ত-প্রকৃতিতে তোমারই প্রেমানন বিশেষ রূপে বিরাজমান দেখি তথাপি নয়ন অতৃপ্ত থাকে। হৃদয় অন্তরে এবং কবিত্বময় বাহ্য জগতে জড় প্রকৃতির সনে তুমি সর্ব্বস্থানে বিদ্যমান আছ দিব্যজ্ঞানে ইহা অনুভব করিয়া সুদূর সীমায় তোমার মুখ সর্ব্বদা দেখি এবং অসীম আকাশ তোমার মধুর সত্তায় পরিপূর্ণ দেখিয়া চাহিয়া চাহিয়া হাসি তথাপি আমার অনন্ত পিপাসা পূর্ণ হয় না। এ জীবনে তোমাকে দেখিয়া দেখিয়া আশা পূরিবে না। তোমার চিন্তা জীবনের শত সুখ বর্দ্ধিত করে। সত্যময় সুকল্পনা দ্বারা হৃদয় প্লাবিত করিয়া এবং হৃদয় নয়ন দ্বারা আজীবন তোমাকে দেখিবে কিন্তু তথাপি সাধ পূরিবে না, তাহা সতত অস্থির থাকিবে। অন্তিমে তোমার মুখ দর্শন করিয়া মরণ-সময়ে অসীম সুখ লাভ করিব কিন্তু চির অতৃপ্তি এমনি করিয়া নিত্য জীবনের সঙ্গে মিশিয়া থাকিবে পরকালের রাজ্যে যাইলেও আত্মায় তোমার দর্শন-তৃষা রহিবে। অমরতার জ্যোতিতে তোমার ঐ সুন্দর বদন আরো উজ্জ্বলতর দেখিব কিন্তু যতই হেরিব সাধ পূরিবে না। নিত্যকাল এইরূপে যাইবে।

নীহারিকা।

প্রথমে, এই কবিতা পুস্তকখানির নামটীতে আমরা একটু কবিত্ব দেখিতে পাই। পুস্তকের নাম লতা নহে, ফুল নহে, কানন নহে, ফুলের মালা নহে, পুষ্পমঞ্জরী নহে, সঙ্গীত নহে। ধরাতলে যাহা যাহা আছে, তাহার মধ্যে কিছুতেই কবির মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারিল না, প্রকাশ করিবার যোগ্য বিবেচিত হইল না। লতা দুই দিন পরে শুকাইয়া যায়—তাহার নবীন শ্যামল পত্ররাজি দুই দিন পরে ঝরিয়া যায়। প্রাতে, ফুলের মুখে হাস্য ঢল ঢল করে, যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোমল শিশু মুখ বলিয়া অনুমান হয়, কিন্তু সন্ধ্যার পূর্ব্বেই দেখি, তাহা তপনতাপে শুষ্ক, মলিন, ক্লিষ্ট, দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। এখন তাহা দেখিলে আর সুখ বলিয়া বোধ হয় না, এখন যেন সেই শিশুগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৈরাশ্যের চিহ্ন স্বরূপ বোধ হয়। এখন তাহারা যেন অস্থায়িত্বের কথা, পরিবর্ত্তনের কথা, মনে করিয়া দেয়। যাহা স্থায়ী, যাহা অনন্ত, যাহা অমর, তাহার সহিত নশ্বর ফুলের কেমন করিয়া তুলনা হইবে? সুতরাং কবি এবার তাঁহার উচ্চ, নির্ম্মল, অমর, ও অনন্ত ভাবগুলি প্রকাশ করিবার নিমিত্ত সঙ্কেতের জন্য উচ্চ ও অনন্ত আকাশের দিকে চাহিলেন। সেখানে যাহা অমর ও দীপ্তিময়, শুভ্র ও বিশাল, তাহারই সঙ্গে নিজের ভাব নিচয়ের সাদৃশ্য দেখিলেন। "নীহারিকা"—ছায়া পথের তারকা-

রাজি, অযুত অযুত জগৎপুঞ্জ যাহা নিশীথে নীল নির্ম্মেঘ আকাশে, জ্যোতির্ব্বেত্তা দূরবীক্ষণ-লগ্ননেত্রে নিরীক্ষণ করেন—যাহা "তারকিত" কবি রজনীর কুহক গগনে দেখিতে দেখিতে বিস্ময়ে, সুখে ও অনন্তত্বে ডুবিয়া যান—যাহা দেখিতে দেখিতে ধার্ম্মিকজন পুলকিত শরীর এই বিশ্বরচয়িতার অপার মহিমা অনুভব করেন, সেই "নীহারিকা" সেই "Huge cloudy symbols of a high romance" পুস্তকের নাম। ছায়া পথের শুভ্র নির্ম্মলতার সঙ্গে যে পবিত্রতার ভাব সংযুক্ত রহিয়াছে, তাহা কোন ভাবুককেই বলিয়া দিতে হইবে না। সেই রোমীয় দুহিতা, যিনি কারারুদ্ধ বৃদ্ধ পিতাকে অনশন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার জন্য, নিজের পবিত্র স্তন্যপান করাইয়াছিলেন—বাইরণ যখন সেই সাধ্বী রোমকতনয়ার মহিমা ও পবিত্রতা বর্ণনা করিলেন? * * তখন বলিলেন, "The starry fable of the milky way was not thy story's purity's "নীহারিকা" রচয়িত্রী তাঁহার চিন্তাগুলি * * ভূতলের কোন বস্তুর সহিত তুলনা করিলেন না। কেন না তাঁহার কবিতা * * ছায়াপথের তারকিত কাহিনী সদৃশ কত উচ্চ, কত নির্ম্মল, কত বিশাল ঐ কবিত্ব আকাশের জ্যোতিষ্কগুলি নভোমণ্ডলের জ্যোতিষ্ক অপেক্ষা কম মহৎ নহে, কম উজ্জ্বল নহে, কম বিস্তৃত নহে'। এক একটী ভাব এক একটী তারকা, এক একটী জগৎ। জড় জগতের আয়তনে আমরা সহজেই স্তম্ভিত

হই। একটী গ্রহ, একটী তারা, কত প্রকাণ্ড, অনেকেই সহজে অনুমান করিতে পারেন, কিন্তু একটী ভাল ভাব, একটী ভাল চিন্তা কত প্রকাণ্ড, কত মহান, কয়জন অনুমান করিতে পারেন। মনুষ্য হৃদয়ের চিন্তা কি জলবুদবুদের ন্যায় অস্থায়ী? যেমন ঐ নীল নিস্তব্ধ আকাশে অগণ্য তারকারাজি অমরত্বের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে, মনুষ্যচিন্তা তেমনি সময়ের অনন্ত আকাশে বিরাজ করিতেছে। ঐ তারকাগুলি কখন নষ্ট হইতে পারে, কিন্তু চিন্তা বা ভাব, মনুষ্যের আত্মা, কখন নষ্ট হইবে না। যেমন দূরস্থ জগৎ দূরতা ব্যবধান হেতু আমরা ভাল দেখিতে পাই না, অস্পষ্ট বোধ হয়, তেমনি যেন শরীর ব্যবধান থাকাতে আমরা আমাদের চিন্তা গুলি ভাল করিয়া দেখিতে পাই না। যেমন নক্ষত্র জাল, আকাশের বিন্দু বিন্দু জ্যোতিঃপুঞ্জ, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অপ্রকাশিত অজানিত জগতের নিদর্শন মাত্র, তেমনি যেন বোধ হয় আমাদিগের চিন্তাগুলি এখনও অপ্রকাশিত, এখনও অজানিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড—মানসিক জগতের নিদর্শনমাত্র। ইহ লোকেই হউক, আর পরলোকেই হউক, একদিন তাহার প্রকাণ্ডত্ব ও বিশালতা অনুভব করিয়া বিস্ময়ে ও আনন্দে মুগ্ধ হইব। একটীভাল চিন্তার যে কত মূল্য, কত মহত্ব তাহা আমরা ভাবি না! চিন্তার সহিত ভাল করিয়া পরিচয় করি না। রাস্তাতে যেমন লোক অনবরত চলিয়া যায়, তেমনি আমার হৃদয়ের চিন্তা বা ভাব স্রোত চলিয়া যাইতেছে।

তাহার মধ্যে প্রায় কোনটীরই সহিত ভাল করিয়া আলাপ করা হয় না। আমি একদিন একটী চিন্তাকে দেখিলাম, তাহার সহিত চোখচোখি হইল মাত্র, * * * কতকাল পরে একদিন প্রভাতে উঠিয়া দেখি, হৃদয়ের দ্বারে সেই চিন্তাটী সহাস্য-বদনে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এবার তাহার মুখখানি ভাল করিয়া দেখিলাম। তখন, অনুতপ্ত শৈবলিনীর হৃদয়ে চন্দ্রশেখরের সৌন্দর্য্যের ন্যায় আমার হৃদয়ে সেই চিন্তার সৌন্দর্য্য বিকশিত হইতে লাগিল। তখন বোধ হইল, কি সৌন্দর্য্য ঐ দেব মুখে কি গাম্ভীর্য্য, কেমন সুন্দর হাসি, কেমন মধুর আলাপ দেখিতে দেখিতে শুনিতে শুনিতে রূপে ও ভাষায়, প্রাণ যে সুখে ভরিয়া যাইল, তাঁহার নূতন নূতন কথাতে সুখের নূতন নূতন তরঙ্গ হৃদয়ে উঠিতে লাগিল— অন্তঃকরণ বিস্ফারিত বিস্তৃত হইতে লাগিল। সেই চিন্তা যেন বিশ্ব ব্যাপিয়া ফেলিল। সে চিন্তাটী এখন আর আমার নিকট ক্ষুদ্র নহে—এখন তাহা একটি জগৎ প্রকাণ্ড, বিশাল দীপ্তিময় এখন আমার ভিতরে সেই (চিন্তা) জগৎ অথবা সেই চিন্তা জগতের ভিতরে আমি, তাহা বলিতে পারি না। কেবল এই বলিতে পারি, এক একটি চিন্তা ভাল করিয়া অনুভব করিতে পারিলে এক একটি জগৎ এক একটি তারকা, এবং চিন্তা পুঞ্জ, ছায়া পথ, নীহারিকা এখন নাম ছাড়িয়া বস্তুর বিচার করা যাউক। কিছু কাল হইল আমাদের দেশ এক প্রকার রুগ্ন কবিত্বের আর্ত্তনাদে পরিপূরিত হইয়াছিল।

হেম বাবু "হতাশের আক্ষেপ" লিখিলেন অমনি সহস্র লোক হতাশের আক্ষেপ লিখিতে লাগিলেন—নিরাশ প্রণয়ের উন্মত্ত বিলাপে হতাশের হাহাকারে দেশ পূরিয়া যাইল। পবন দেব প্রণয়ীর নৈরাশ্যের অশ্রু ও দীর্ঘ নিশ্বাসের ভার বহনে যেন অসমর্থ হইয়া পড়িলেন। 'পুড়িলাম মরিলাম'—"বাবারে মারে" গেলাম্‌রে ম'লামরে" "আত্মঘাতী হব," "বিষ আন্‌, ছুরি আন্‌" প্রাণ রাখব না—কোন মতেই রাখব না"—"প্রাণ যে বেরোয় না"—এবম্বিধ কিম্ভূত কিমাকার কবিত্বের আর্ত্তনাদে কান ঝালা পালা হইয়া উঠিয়াছিল। কবিতাতে যে ক্রন্দন ব্যতীত আর কিছু আছে তাহা অনেক নিরাশ দুঃখী কবি পেচক অনুভব করিতে পারে না। * * * * * * * * আমাদের দেশে কবিত্বের যে কান্নার যুগের কথা বলিতে ছিলাম, তাহার এখন অবসান হইয়াছে বোধ হয়। কবিত্বের নব যুগ, সুখের যুগ উপস্থিত। "নীহারিকা" এই যুগের একটী মহৎ সঙ্গীত। "নীহারিকা" রচয়িত্রী এই যুগের একজন প্রধান ও প্রাভাতিক কবি। দীর্ঘ তামসী রজনী অবসানে প্রভাতে মধুর ললিত রাগিণী কেমন কাণে লাগে, পূর্ব্ব গগনে সুখময়ী উষার কোমল কনক হাস্য যেমন চোখে লাগে, "নীহারিকা"—ইহার প্রধান কয়েকটি কবিতা—আমাদের হৃদয়ে তেমনি লাগিল—নির্ম্মল জ্যোতির্ম্ময়, তরঙ্গায়িত সুখপ্লাবন।

"নীহারিকা" কোন্ প্রকৃতির কবিতা তাহা সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিয়া

এখন আমরা দুই একটি কবিতা দ্রুতবেগে সমালোচন করিব আমাদিগের মতে এই পুস্তকের মধ্যে "জীবন্ত কাব্য" "সব বর্ত্ত-মান," "সাধ পূরিল না"—এই তিনটি সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ কবিতা। এই প্রকৃতির কবিতার মধ্যে আধুনিক সমগ্র বাঙ্গালা সাহিত্যে এতদ-পেক্ষা ভাল কবিতা আছে তাহা আমরা জানি না। বস্তুতঃ প্রেমের এমন উচ্চ ও বিশুদ্ধ বর্ণনা ভাষাতে বিরল। এতদ্ বর্ণিত প্রেম এমনি অশরীরী, আধ্যাত্মিক ও প্রাণ পূর্ণ যে ইহা পড়িতে পড়িতে কখন ঐশ স্তোত্র বলিয়া ভ্রম হয়। এই নিমিত্তই বোধ হয়, ইহার মধ্যে "জীবন্ত কাব্য" ও সাধ পূরিল না" এই দুইটি কবিতা, কথ-ঞ্চিৎ রূপান্তরিত হইয়া, ভক্তিভাজন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে অতি সুন্দরভাবে বিভুস্তবে প্রয়োজিত হইয়াছিল।

এই কবিতাগুলিতে ভাল বাসার চিত্রে এত উচ্চ ভক্তি, এমন পূর্ণ আত্মোৎসর্গ এমন নির্ম্মলও বিশ্ববিজয়ী সুখদীপ্তি পাইতেছে যে আমা-দের কখন কখন বোধ হয় সীমাবদ্ধ দুর্ব্বল ক্ষুদ্র মনুষ্য এই অসীম ভক্তি পরি- প্লাবিত, মহীয়সী ভালবাসা পাইবার উপযুক্ত নহে, ইহার উপযুক্ত আধার কেবল মাত্র সেই অসীম অনন্ত ঈশ্বর, যিনি ভাল বাসার আদি প্রস্রবণ। "সাধপূরিল না" কবিতাতে, কবি অতৃপ্ত অন্তরে; দিবস রজনীতে অরুণ কিরণে একাকী নিশীথে নীল আকাশের দূরাগত সঙ্গীতের তানে—নীলিমা সাগরের অযুত তারকা দলে-নিদাঘ গগনের নবীন জলদে নব পল্লবিত কুসুম কোমলা বসন্ত প্রকৃ-

তিতে—গভীর নিশার সুখ স্বপ্নে—সায়াহ্নে রক্তিম রবির সান্ধ্য শোভায়—সৌন্দর্য্যে ও ভালবাসার তরঙ্গ সংমিশ্রিত করিয়া তাঁহার হৃদয়ের স্নেহের ছবি, প্রীতির প্রদীপ্ত মূর্ত্তি পুলকিত তৃষিত আঁখিতে দেখিয়া দেখিয়াও অসীম সুখ লাভ করিয়াও জীবনে অতৃপ্ত থাকিলেন। পরে সুখ কল্পনা মৃত্যু অতিক্রম করিয়া জীবনের অপর পারে মৃত্যুর অন্ধকার রাজ্যে, কবিত্বের আলোক বিস্তৃত করিয়াছে” তাই কবি বলিতেছেন।

“জাহ্নবী সৈকতে দগ্ধপরমানু মম রহিবে যখন” ইত্যাদি।

এমন সুন্দর কবিতা পড়া আমাদের ভাগ্যে অতি কমই ঘটে। এইটি পড়িয়া আমাদিগের মনে টেণিসণের পশ্চাল্লিখিত কবিত্বময় ছত্র কয়েকটি মনে পড়িল;—

“She is coming, my own, my sweet” ইত্যাদি।

টেণিসনের এই কবিতাটি অপেক্ষা নীহারিকা রচয়িত্রীর উপরের কবিতা কোন অংশে ন্যূন নহে, তাহা আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি। ইহাতে আমরা অবশ্য এমন কথা বলিতেছি না যে “নীহারিকা” রচয়িত্রী বাঙ্গালার টেণিসন। আমরা কেবল এই কথা বলিতে চাহি যে “সাধ পূরিল না”—“জীবন্ত কাব্য” এবং সব বর্ত্তমান “এই তিনটি কবিতা ইংরাজী বা বাঙ্গলা সাহিত্যে (ঐ প্রকৃতির কবিতার মধ্যে) কোন কবিতার নিম্নে নহে। আমাদিগের এই সাহসের কথা শুনিয়া কেহ যদি বিস্মিত হ'ন অথবা আমাদের

বিচার শক্তিকে বিদ্রূপ করিতে উত্তেজিত হন তাহাহইলে তিনি যেন ঐ কয়েকটী কবিতা পড়েন। শেলির Skylark ওয়ার্ডসওয়ার্থের "Cuckoo" শিবনাথ বাবুর "ফুল" যদি ও ভিন্ন প্রকৃতির কবিতা তথাচ নীহারিকা রচয়িত্রীর ঐতিনটি কবিতার সহিত তাহাদিগের এক প্রকার সাদৃশ্য আছে—বিশ্ব ব্যাপী সুখে ও কবিত্ব প্লাবনে।

জীবন্ত কাব্যে "কবি ভাল বাসার জীবনকে কাব্য বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন। কবিদিগের নিকট জগতে কাব্যই সকল বিষয়ের অপেক্ষা অধিকতর মনোহর। কিন্তু বর্ত্তমান কবি বলিতে চান তাঁহার জীবন কাব্যে, তাঁহার প্রেম ভক্তি সুখময় প্রাণে, যে কবিত্ব আছে, তাহা কোন গ্রন্থকাব্যে, তাহা জগতে কুত্রাপি নাই।

* * *

* * *

ভালবাসার দেব শক্তিতে কেবল জীবন কাব্য হইল তাহা নহে ঐ দেব শক্তিতে সমুদয় জগৎ অবশেষে কাব্যে পরিণত হইল।

* * *

ভালবাসার এই এক প্রকার বিশ্বময়তা জীবন্ত কাব্যের অপেক্ষাও "সাধ পূরিল না" কবিতাটিতে অধিক বিকশিত হইয়াছে। "জীবন্ত কাব্যে" সংসারে যাহা কিছু সুন্দর আছে দেখান হইল—তদপেক্ষা তুমি (প্রেমাধার) অধিকতর সুন্দর। "সাধ পূরিল না"—কবিতাটিতে প্রদর্শিত হইল, বিশ্বজগতই অধিকতর সুন্দর হইয়া গিয়াছে; তখন

জগতের সুন্দর বস্তুতে আর তোমাতে প্রভেদ নাই। তখন তুমি আর জগৎ—সুন্দর তুমি আর সুন্দর জগৎ—এক, তাই কবি বলিতেছেন—

"দিবস রজনী
চিন্তায় মিশিয়া আছে তোমার মূরতি" ইত্যাদি।

"সাধ পূরিলনা" এ সমগ্র কবিতাটীর যেন মর্ম্ম—"তুমি প্রিয় বিশ্বময়"—কবি যেন প্রকারান্তরে বলিতেছেন, ভালবাসার এই উচ্চ অবস্থাতে আসিয়া আমি এখন দেখিতেছি, হেপ্রিয়, তুমি আমি এবং জগৎ এক, এখন First Person, Second Person এবং Third Person এ প্রভেদ নাই—এখন দুইটী আত্মা এক হইয়াছে, এক হইয়া যেন পরমাত্মাতে বিলীন হইতেছে। এখন প্রেম অদ্বৈতবাদে উন্নীত। এখন বাস্তবিক জীবন স্বপ্ন, এখন স্বপ্ন বাস্তবিক জীবন বাস্তবিক জীবন স্বপ্নের ন্যায় আশ্চর্য্য, স্বপ্নের কল্পনা বাস্তবিক জীবনে পরিণত।

যখন হৃদয় এইরূপে Beauty ও Harmonyতে প্লাবিত হয়, তখন হৃদয় স্বতই জিজ্ঞাসা করে,

"কে আনিল এত শোভা সংসার ভবনে তখনশনৈঃ শনৈঃ অন্তরে এই প্রশ্ন প্রবেশ করে—"হৃদয় আকাশে এই যে সুখের নীহারিকা, এই যে সৌন্দর্য্যের জগৎরাজি প্রস্ফুটিত হইয়াছে—

Are not these, O soul the Vision of him ইত্যাদি।

আর্য্যদর্শনে প্রকাশিত। ভাদ্র ১২৯১।)

Niharika.

A collection of beautiful little poetical pieces, far above the average of current Bengali poetry, by the well known authoress of *Banalata*, published by S. K. Lahiri &Co. 14 College square.

(Indian Nation.)

Niharika.

This is a book of poetry from the pen of a talented Hindu lady. We need not introduce the fair authoress to our readers as she has already earned a name and a fame from her first rate poetic production—Banalata. The book under review, comes of several short poems on various subjects all of which are singularly well written. To the great credit of the authoress it must be said that the book bears the impress of a mind, capable of appreciating the grand and the beautiful, of grasping the sublimity, vastness and grandeur of the objective world, and of clearly and vividly expressing our passions and sentiments by giving them a shape, and a form to our undescribeable ideas. She has freed herself from the trammels of our vulgar rhyme manufacturers of the day, and soars into the high regions of imagination. In purity of thought, sweetness of diction, vividness of description and

rhythmical flow of language, she has undoubtedly excelled many a well known poet of the day. Her acquaintance with the English language and her thorough appreciation of the English poets have greatly contributed to her success. We gladly recommend the book to every lover of vernacular literature.

4 July 1884. Indian Echo.

We welcome with pleasure this fresh instalment of the literary labors of the authoress of Banalata—a poeticalf piece which has been so highly spoken of, and deservedly too, by the press. The work under notice consists o fugitive pieces on different subjects, all testifying to the warmth of feeling and the versatility of genius possessed by the fair writer. It is abundantly clear from some of the pieces that the writer feels deeply for her country, and can give powerful expression to those feelings through the medium of pathetic and excellent verses. Some other pieces are translations of, or adaptations from English lyrics. The writer has devoted not a few of the pieces to personal subjects, and herein she has shown an affectionate heart which is so characteristic of the sex and particularly of the nationality to which she belongs. This book may certainly be held up as a fair specimen of the spirit

in which Hindu ladies of the period are being brought up.

Indian Mirror 29 April 1889.

We beg to acknowledge with thanks the receipt of a copy of *Niharika* a collection of metrical compositions by a lady. We have not the pleasure of knowing who this gifted writer is; but it appears that she has already secured for herself a high place in the domain of vernacular literature.

Her Banalata is a work of considerable merit, illumined by flashes of genius which at once strike the imagination and melt the heart. Indeed one such work is alone sufficient to establish the claims of a writer to be one amongst the few favoured companions of the muses. But if the success of *Banalata* is so great, that of the *Niharika* is none the less remarkable. Its versification is sweet and melodious, while its style is chaste, flowing and forcible, occasionally rising to a pitch of pathos which has the touch of inspiration. But what we admire most in the book before us, is that the gracefulness of its manner is on a par with the excellence of its matter. We regret we cannot allow space to review it at length the different pieces contained in this volume. They are all

good in their own way but *Basanta Panchami*, the line on *the moon light* and the *Arya nari* and the *Jiban Kahini* are decidedly the best and can will stand comparison even with the masterly strokes of Hemachandra's genius. We read those pieces over and over again, and on every occasion we derived new pleasure from contemplation of the splendid imageries and of the most lively descriptions of nature, which so pre-eminently distinguish them from the average run of poetry amongst us at the present day and but those who have carefully studied the the best English poets of modern times, could know to embellish his writings in this way. We will not say any thing more, except that for obvious reasons we commend the *Niharika* to the notice of all persons interested in the cause of female education in this country.

May 31st 1884. Bengali.

Niharika. By the authoress of *Banalata.*

The poetry of this is of the lyrical order, various affections of the heart finding very eloquent expression in it. In literary culture, polish and refinement, the authoress of *Niharika* seems to us superior to * * Her versification and the artistic execution of the poems of the authoress of *Niharika* are therefore better than those of * *

The fair authoress of Niharika seems also to possess a subtler and wider knowledge of men and the human heart than the authoress of * * * January 1885.

Calcutta Review.

Two volumes of lyric poetry writter by a Bengali lady were received during the year one of them *Niharika* by Srimati * * Debi, exhibited much litetary finish and refinement of feeling. April 29th 1884

Indian Mirror.

নীহারিকা।—"বনলতা" রচয়িত্রী কর্ত্তৃক প্রণীত।

এই কবিতা গ্রন্থ খানি বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। রমনী রচিত বলিয়া নহে, পুরুষে লিখিলেও নিঃশংসয়ে ইহাকে যথেষ্ট প্রশংসা করা যায়। যদি ভাবে আদি মত্ব থাকে; ভাষায় মাধুরী ও প্রাঞ্জলতা থাকে, যদি কবিতা গুলি সত্য সত্যই হৃদয়স্পর্শী হয় তবে তাহার প্রশংসায় স্ত্রী পুরুষে ভেদ দৃষ্টি হইবে কেন? বাঙ্গালা সাহিত্য জগতের ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আজি আনন্দিত হইতেছি। 'নীহারিকা' রচয়িত্রী তাঁহার প্রতিভা—প্রসূত ভাব শিশুগুলিকে দরিদ্র বঙ্গ সাহিত্যের ভাণ্ডারে উপহার দিতেছেন। তবে বুঝি এত দিনে ইংলণ্ডের মত আমরাও হারিয়ট মার্টিনু বা জর্জ ইলিয়ট সদৃশী ললনার গৌরবে গৌরবান্বিত হইতে পারিব।

(নব ভারত, ১০ই ভাদ্র ১২৯১।)

We wonder how many of our so-called educated men can write with the flow of language or the genuineness of feeling among others of the elegant composer of *Niharika.* 11th April 1884. The Education Commision. VII

নীহারিকা।—"বনলতা" রচয়িত্রী প্রণীত।

এতৎপাঠ কালে সাহিত্য দর্পনকার কৃত "কাব্যং রসাত্মকং বাক্যং" এই লক্ষণটি স্মৃতি পথে উদিত হইল। আমরা "নীহারিকার" যে যে স্থান পাঠ করিলাম সেই সেই স্থানই আমাদের হৃদয়ে রস ভাবময় মধু ঢালিয়া দিল। অনেক স্থলেই অসামান্য রূপ না হউক, কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাইয়াছি।

(সোমপ্রকাশ ৩রা বৈশাখ ১২৯১।)

(সুরভি—৩১ বৈশাখ ১২৯১)

নীহারিকা।—"বনলতা" রচয়িত্রী কর্ত্তৃক প্রণীত।

স্বাভাবিক কবিত্ব শক্তি না থাকিলে কবিতা লেখার ন্যায় বিড়ম্বনা আর কিছুই নাই। বঙ্গ সাহিত্যে এরূপ বিড়ম্বনার বড় প্রাচুর্য্য। আমরা দেখিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে সমালোচ্য গ্রন্থখানি কোন অংশেই সেরূপ বিড়ম্বনা নহে। গ্রন্থ রচয়িত্রীর স্বাভাবিক কবিত্ব শক্তি আছে। তাঁহার হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে পর্ব্বত-বাহিনী স্রোত স্বতীর ন্যায় প্রচণ্ড বেগে যে কবিত্বের প্রবাহ প্রবাহিত হইতে থাকে এই গ্রন্থের অনেক স্থলে তাহার পরিচয় পাওয়া

যায়। এই গ্রন্থে সর্ব্বশুদ্ধ ২১টী কবিতা আছে—তন্মধ্যে কেবল দুইটী মাত্র ইংরাজীর অনুবাদ। কবিতা গুলির মধ্যে "জীবন্ত কাব্য" "সবর্ত্তমান," "সাধ পূরিল না" "প্রিয় নিদর্শন" এবং "উদাসীন" শিরস্ক কবিতা মধ্যে "ছুটিল স্বর লহরী" (১০২ পৃষ্ঠা) হইতে "মানব জীবন হয় দেব নিকেতন" (১০৪ পৃষ্ঠা) পর্য্যন্ত, এই কয়েকটি কবিতা অতি উৎকৃষ্ট। এই গুলির ভাবের গাম্ভীর্য্য, গভীরতা ও সৌন্দর্য্যে আমরা মোহিত হইয়াছি। এইগুলিকে প্রথম শ্রেণীর কবিতা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এতদ্ব্যতীত "সেই চন্দ্রালোকে," "প্রিয়ফুল" "সাধের নলিনী" প্রভৃতি কতকগুলি কবিতা অতি মনোহর। "সব বর্ত্তমান" শিরস্ক কবিতার এক স্থলে প্রেমাবদ্ধ দুইটি আত্মার গাঢ় সম্মিলন এই স্থলে অতি সুন্দর রূপে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে উচ্চ দরের কবিত্বের আভাস পাওয়া যায়। "সাধ পুরিল না" শিরস্ক কবিতাতে যে ভাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহা অতি উচ্চ ও সুন্দর কবিত্বময়। এই গ্রন্থ রচয়িত্রীর প্রথম পুস্তক বনলতার সহিত এই গ্রন্থ তুলনা করিলে দেখা যায় যে তাঁহার কবিত্ব শক্তি ক্রমে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইতেছে। "নীহারিকার" কতকগুলি কবিতার ভাবের যে গাম্ভীর্য্য, গভীরতা ও উচ্চতার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে তাহা "বনলতায়" নাই। আমাদের দৃঢ় সংস্কার "নীহারিকা" রচয়িত্রী একমনে সরস্বতীর সেবায় নিযুক্ত থাকিলে উচ্চতর কবিত্বশক্তির পরিচয় দিতে পারিবেন। এ পর্য্যন্ত অনেক

গুলি রমণী পদ্যে বাঙ্গালা ভাষায় অনেকগুলি গ্রন্থ লিখিয়াছেন কিন্তু "বনলতা" ও নীহারিকা রচয়িত্রী যেরূপ স্বাভাবিক উচ্চদরের ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন সেরূপ আর কেহ পারেন নাই। এই গ্রন্থাবলী বঙ্গ সাহিত্য মন্দিরে বহুকাল সম্মাননীয় স্থান অধিকার করিবে।

নীহারিকা।—ইহা একটি পদ্যময় গ্রন্থ; দেশের গৌরব স্বরূপা কোন বঙ্গ মহিলা ইহার রচয়িত্রী। আমরা এই পুস্তক খানি পাঠ করিয়া অতীব আনন্দ লাভ করিয়াছি। এই পুস্তক খানি যিনি পাঠ করিয়াছেন তিনিই যে মুক্ত কণ্ঠে ইহার প্রশংসা কীর্ত্তন করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। বাস্তবিক ও গ্রন্থ মধ্যে যে সকল কবিতা সন্নিহিত হইয়াছে তাহার প্রায় সকল গুলিতেই প্রথম শ্রেণীর কবিত্বের নিদর্শন পাওয়া যায়।

মেদিনী—১০ই শ্রাবণ ১২৯১।

নীহারিকা।—"বনলতা" রচয়িত্রী কর্ত্তৃক প্রণীত।

নীহারিকা রচয়িত্রী আমাদের পরিচিতা। তাঁহার বনলতার অনেক বনকুসুম প্রথমে সাধারণীর শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিল। তিনি সাহিত্য সংসারেও পরিচিতা; তাঁহার বনলতা সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়াছিল।

গ্রন্থ কর্ত্রী আপনার মনের কথা সরস্বতী পাদ পদ্মে এইরূপে নিবেদন করিয়াছেন।

"তব কৃপা করি সার" ইত্যাদি—আমরাও বলি, গ্রন্থকর্ত্রীর মনো-বাঞ্ছা পূর্ণ হউক তাঁহার কবিতা মুকুল সকল ক্রমেই বিকশিত হইয়া সৌরভ বিস্তার করুক তিনি সরস্বতীর প্রিয়-পাত্রী বরপুত্রী হউন।

প্রায় সকল কবিতাগুলিতেই নীহারিকা নাম করণের সার্থকতা আছে। উজ্জ্বলতার সঙ্গে সঙ্গে ধূসরতা মিলাইয়া আছে। চর্ম্ম চক্ষে দেখিলে নীহারিকা কেবল ছায়াময়ী। দূরবীক্ষণের মর্ম্ম চক্ষে দেখিলে স্পষ্ট কায়াময়ী। গ্রন্থকর্ত্রীর অন্তঃকরণের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থকর্ত্রী যে কেবল প্রীতি ও করুণ রস লইয়া বিব্রত তাহা নহে, উৎকট রস বর্ণনেও তাঁহার বিলক্ষণ পটুতা আছে। তাঁহার কবিত্ব, সরলতা, শক্তি এবং ভক্তি সকলই মনোরম, আমরা ভরসা করি আমাদের সহিত সকলেই রচয়িত্রীর কবিত্বের পূর্ণ বিকাশ কামনা করিবেন।

(২৫ শে চৈত্র সাধারণী। ১২৯২)

নীহারিকা।—"বনলতা" রচয়িত্রী কর্ত্তৃক প্রণীত। গ্রন্থকর্ত্রী বনলতা লিখিয়া একবার আপনার কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিয়াছেন—নীহারিকা তাঁহার যশ আরও বৃদ্ধি করিবে। রমণী হৃদয় যে দেশের জন্য কাঁদিতে শিখিয়াছে, স্বদেশের দুর্গতি দেখিয়া সমাজের অধোগতি স্মরিয়া নারী জাতির প্রতি অত্যাচারে মর্ম্মাহত হইয়া কাঁদিতে শিখিয়াছে নীহারিকা তাহার পরিচয়। নারীজাতি যে কেবল সংসারের আহার বিহার ভোগাবিলাস লইয়াই আর

অনেক দিন ব্যস্ত থাকিবেন না এইগ্রন্থ তাহার অন্যতম প্রমাণ। রমণী ভাবিতে শিখিয়াছেন আশান্বিত হইলাম। নীহারিকায় প্রকৃত কবিত্ব আছে—আমরা নারী কবিকে প্রশংসা করি।

সঞ্জীবনী। ৮ই বৈশাখ ১২৯১।

"আর্য্যবর্ত্ত সম্বন্ধে" পূর্ব্বেই "Indian Mirror" লিখিয়াছেন যে The account of her travels by a Hindu lady is an interesting contribution. (23rd August 1888.)

An interesting account of a Travel in Aryavarta. written by a Hindu lady.
